জান্নাতি জীবন

গুনাহমুক্ত জীবন ও তাওবাযুক্ত আমল করে জান্নাতি জীবন গড়ার পাথেয়

(বইটি শারঈ ফ্যামিলির লেকচার থেকে সংকলিত ও সম্পাদিত)

লেখক

মাওলানা মামুনুর রশীদ

আমীনুত তালীমাত

মারকাযুল হিকমাহ আবু বকর সিদ্দিকী ﵁ মাদ্রাসা

সারুলিয়া, ডেমরা, ঢাকা

সন্দীপন

প্রকাশন লিমিটেড

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ভূমিকা

জান্নাতি জীবন: বইটিকে এ শিরোনাম দেওয়ার কারণ হচ্ছে, এই বইয়ের মূল লক্ষ্য একজন মুসলিমকে জান্নাতি জীবনের সন্ধান দেওয়া। একজন মানুষ দুনিয়াতে আসার উদ্দেশ্যই হলো নিজেকে কী করে জান্নাতি হিসেবে গড়ে তুলবে—সেই ভাবনা নিয়ে ঈমান আর আমলের পেছনে লেগে যাওয়া। আর একথা সর্ব স্বীকৃত যে, শাহাদাত লাভ করা জান্নাতে যাওয়ার সবচেয়ে বড় সুযোগ। তবে শাহাদাত সবাই লাভ করতে পারে না। কারণ শাহাদাত শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলার হাতে। তা ছাড়া শাহাদাত লাভ করার সুযোগ সর্বদা সহজলভ্যও নয়। কিন্তু যেভাবেই হোক, আমাকে তো জান্নাতে যেতেই হবে; এ ছাড়া যে আমার ভিন্ন কোনো পথ নেই। আর জান্নাতে যেতে হলে দুনিয়াতেই জান্নাতের পথে চলতে হবে, জান্নাতের উপযোগী জীবন সাজাতে হবে।

জান্নাতে যেতে হলে, জান্নাতের উপযোগী জীবন সাজাতে হলে, সর্বপ্রথম আমার-আপনার জীবনকে নবিদের মতো, বিশেষ করে মুহাম্মাদে আরাবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মতো করে সাজাতে হবে। আর নবিদের মতো করে জীবন সাজাতে হলে প্রথমে যে ভাবনা আমার দিলে বসাতে হবে সেটা হলো—নবিদের মতো আমার জীবনকে গুনাহমুক্ত করতে হবে। কারণ গুনাহ নিয়ে জান্নাতে যাওয়ার সুযোগ নেই।

এরপর দ্বিতীয় যে বিষয় আমার জন্য জানা জরুরি তা হলো—আমি যতদিন বাঁচব, এই দ্বীনের ওপর আমাকে টিকে থাকতে হবে। আর দ্বীনের ওপর টিকে থাকতে হলে অবশ্যই নেককার হক্কানি উলামায়ে কেরামের সঙ্গ অবলম্বন করতে হবে। উলামায়ে কেরাম থেকে দূরত্ব মানুষকে দ্বীন থেকে সরিয়ে দেয়।

অতঃপর তৃতীয় যে বিষয়টি জানা আমাদের জন্য জরুরি সেটা হলো—শয়তান কিভাবে কিভাবে উলামায়ে কেরাম থেকে, নেককারদের থেকে আমাদেরকে দূরে সরিয়ে নেয়।

চার নম্বরে আমাদের জানতে হবে যে, আমার-আপনার নেক আমল কোন কোন গুনাহের কারণে সর্বোচ্চ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ ক্ষেত্রে নারী ও পর্দার বিষয় সংশ্লিষ্ট গুনাহগুলোর নামই আসবে সবার আগে। তাই আমাদেরকে ভয়াবহ

এই গুনাহগুলোর একটি বিস্তারিত তালিকা জেনে নিতে হবে। এরপর আসবে জবান হেফাজতের প্রসঙ্গ। বিশেষ করে, মানুষের ব্যাপারে অপপ্রচার করার ফলে একজন ব্যক্তি কী কী গুনাহে আক্রান্ত হয়—তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমাদের জানা থাকতে হবে। সবশেষে আমরা আলোচনা করব, গুনাহ থেকে কিভাবে তাওবা করলে গুনাহ মাফের আশা করা যায় এবং জান্নাতি হওয়ার স্বপ্ন আঁকা যায়।

মামুনুর রশীদ
আমীনুত তালীমাত
মারকাযুল হিকমাহ আবু বকর সিদ্দিকী ﵁ মাদ্রাসা
সারুলিয়া, ডেমরা, ঢাকা

সূচির পাতা

গুনাহমুক্ত জীবন গড়ি ৯

সবচেয়ে প্রিয় আমল ১১
প্রথম দলিল ১৪
দ্বিতীয় দলিল ১৭
ইবাদতের উদ্দেশ্য ১৮
কী পরিমাণ গুনাহ ছাড়তে হবে ১৯

দ্বীনি রাহবারদের ব্যাপারে সতর্ক হোন ২৫

হুজুররাও ভুল করতে পারে ২৫
আমাদের প্রান্তিকতা ২৮
জুড়ে থাকার অর্থ ৩০

দূরে সরানোর শয়তানি ফাঁদ ৩৩

অপপ্রচার ৩৪
তাঁদেরকেও ছাড় দেবো ৩৯

অপপ্রচার যখন কুফরে নিফাক হয় ৪১

অপবাদ ও অপপ্রচারের পরিচয় ৪২
অপবাদ ও অপপ্রচারের হুকুম ৪২
অপবাদের ঘটনা ৪৩
গোনাহ কোনটা, নিফাক কোনটা ৪৭
ফাতাওয়ার দৃষ্টিতে কতটা ভয়ানক ৪৯
আলিমদের সমালোচনা করার ভয়াবহতা ৫৩

অপপ্রচারের কালো ফাঁদ ৫৬

১. ইসলামি ভ্রাতৃত্ব নষ্ট করা ৫৭
২. শত্রুতা সৃষ্টি করা ৫৮
৩. হিংসার বীজ বপন করা ৬০
৪. একজন আরেকজনকে তিরস্কার করা ৬১
৫. একে অপরকে দোষারোপ করা ৬২
৬. মন্দ নামে ডাকা ৬৩
৭. খারাপ ধারণা পোষণ করা ৬৪
৮. গীবতে লিপ্ত হওয়া ৬৬

৯. দোষত্রুটি তালাশ করা ৬৭
১০. হেয় প্রতিপন্ন করা ৬৮
১১. বৈশ্বিক অপরাধ ৬৮

১২. যে গুনাহ্ দিচ্ছে খুলে অর্ধশত গুনাহের দ্বার ৭০

১৪. মানুষ যে নামে তাকে চেনে ৭০
১৩. অবৈধ সম্পর্কের মানে ৭১
সাবধান হই, সতর্ক হই ৮১
পারিবারিক জীবন ধ্বংস হয় ৮৫

পর্দার বিধান ঈমানের সাথে যুক্ত ৮৯

পর্দার স্তরসমূহ ৮৯
প্রথম স্তরের আলোচনা ৯১
দ্বিতীয় স্তরের আলোচনা ৯৭
তৃতীয় স্তরের আলোচনা ১০৩

পর্দার বিধান লঙ্ঘন করার গুনাহ্ ১০৬

প্রথম পয়েন্ট ১০৬
দ্বিতীয় পয়েন্ট ১০৭
তৃতীয় পয়েন্ট ১০৮
বর্তমান জমানার হালচাল ১০৯
মিউজিক ও বেপর্দা নারী ১১৪
আদর্শ মা ১১৭

তাওবা : গুনাহ্ থেকে মুক্তির উপায় ১১৯

গুনাহ্ ছাড়তে হবে আল্লাহর ভয়ে ১১৯
তাওবার হাকিকত ১২৬
বান্দার হক নষ্টকারীর তাওবা ১২৭
বান্দার জানের হক নষ্টকারীর তাওবা ১২৮
বান্দার মালের হক নষ্টকারীর তাওবা ১৩৮
মুমিনের ইজ্জত নষ্টকারীর তাওবা ১৪২
গীবতের তাওবা ১৪৬
নামাজ কাযার তাওবা ১৪৯
তাওবা কবুলের আলামত ১৫২

গুনাহমুক্ত জীবন গড়ি

আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا

‘তোমাদেরকে যে বড় বড় গুনাহ করতে নিষেধ করা হয়েছে, তোমরা যদি তা পরিহার করে চলো, তবে আমি নিজেই তোমাদের ছোট ছোট গুনাহ তোমাদের থেকে মিটিয়ে দেবো এবং তোমাদেরকে এক মর্যাদাপূর্ণ স্থানে দাখিল করব।’[১]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

اتَّقِ الْمَحَارِمَ تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ.. الحديث

‘নিষিদ্ধ ও হারাম জিনিস থেকে বেঁচে থাকো, তাহলে তুমি মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় আবিদ।’[২]

নিশ্চয়ই আমাদের দিলের ভেতরে আল্লাহর কাছে সবচাইতে বেশি প্রিয় হওয়ার আমল সম্পর্কে জানার ইচ্ছে আছে। যদি আমরা ইতিমধ্যেই তা জানি, তবে ওই আমল আমার জীবনে বাস্তবায়ন করতে হবে। তাহলেই আমি আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় হব, ইনশাআল্লাহ।

ওই আলোচনায় যাওয়ার আগে, ভূমিকাস্বরূপ আমাদের জানতে হবে যে, আমাদের জীবনটা তিনটা অংশে বিভক্ত। কুরআনই এ তিনটা ভাগ করেছে।

একটা ভাগ হলো, প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার আগ পর্যন্ত সময়টা। আপনারা কেউ ‘শিশু’

---

[১] সূরা আন-নিসা, ৪ : ৩১।

[২] মুসনাদে আহমাদ, ৮০৯৫; তিরিমিজি, ২৩০৫; সহিহুল জামে ৪৫৮০, ৭৮৩৩। হাদীস সহিহ।

বলেন, কেউ 'কিশোর' বলেন। আমি শরীয়তের আঙ্গিকে বিষয়টা বলব।

কেউ যদি পঞ্চাশ বা ষাট বছর পর্যন্ত বাঁচে, আল্লাহ তাআলা এ পুরো সময়টাকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۖ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ

'আল্লাহ—যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন দুর্বল বস্তু থেকে এবং দুর্বলতার পর তিনি শক্তি দান করেন। আর শক্তির পর তিনি আবার দেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং তিনিই সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।'[৩]

আল্লাহ তাআলা এখানে তিনটা ভাগ করেছেন :

- প্রাপ্তবয়স্ক বা বালেগ হওয়ার আগের সময়টা,
- প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর যৌবনকাল,
- যৌবনের পরে বার্ধক্যকাল।

কুরআন বয়সকে ভাগ করেছে তিন ভাগে। ইসলামি শরীয়তে, সাধারণত আমাদের ছেলেদের বয়স বারো বছর হওয়া পর্যন্ত অপ্রাপ্তবয়স্ক বা নাবালেগ ধরা হয়। এরপর ছেলেরা প্রাপ্তবয়স্ক হতে পারে। তাহলে বারো বছরের আগ পর্যন্ত একটা ছেলে কী? অপ্রাপ্তবয়স্ক। আর মেয়েদের ক্ষেত্রে শরীয়ত বিষয়টি হিসাব করতে থাকে নয় বছর থেকে। তার মানে নয় বছর হওয়ার পর মেয়েরা প্রাপ্তবয়স্কা হতে পারে। সেটা দশ বছরেও হতে পারে, এগারো বছরেও হতে পারে, আবার তেরো বছরেও হতে পারে। কিন্তু নয় বছর বয়স হওয়ার আগ পর্যন্ত একটা মেয়ে অপ্রাপ্তবয়স্কা।

বর্তমানে আমাদের সমাজে বাল্যবিবাহ নামে যে বিবাহ আছে, এই নামের বিবাহের বয়সটা মেয়েদের ক্ষেত্রে আঠারোর নিচে আনা হয়েছে। বাল্যবিবাহের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে আঠারো বছরের চেয়ে কম বয়সে একটা মেয়ের বিবাহকে। আর আঠারোর ওপরে হলে ঠিক আছে। এর আগ পর্যন্ত নাকি বাল্যবিবাহ! শরীয়তের হিসাবটা হলো, একটা মেয়ের বয়স নয় বছর হওয়ার সাথে সাথে তার প্রাপ্তবয়স্কা হওয়ার সম্ভাবনা শুরু হয়ে গেছে। আর ছেলেদের ক্ষেত্রে, বারো বছরের পর থেকে একটা ছেলে প্রাপ্তবয়স্ক হতে পারে।

তো, একটা ছেলে অথবা একটা মেয়ে যখন প্রাপ্তবয়স্ক আর প্রাপ্তবয়স্কা হয়,

[৩] সূরা আর-রুম, ৩০ : ৫৪।

এটা হলো আল্লাহর কাছে সবচেয়ে দামি সময়। যৌবনকাল। আমাদের দেশে যৌবনকাল যেমন আঠারোর পর থেকে শুরু হয়—বিষয়টা এমন না। দয়া করে এমনটা ভাববেন না। তাহলে কোনো বোন যদি নয় বছরে প্রাপ্তবয়স্কা হয়ে যায়, তাহলে তার সবচেয়ে দামি সময় শুরু হয়ে গেছে। আর ছেলেদের সাধারণত বারো বছরের পর থেকে শুরু হয়ে যায়। এই সময়টা আল্লাহর কাছে সবচেয়ে দামি। আর সবশেষে, বার্ধক্য। বার্ধক্যের বিষয়ে পরে বলব। কিন্তু মূল দামি সময় মানুষের বয়সের ক্ষেত্রে যৌবনের সময়টা। আর যৌবন শুরু হয় কত বছর বয়স থেকে? আঠারো থেকে? না, বালেগ হওয়ার পর থেকেই।

এখন যদি এমন নিয়ম হয়ে থাকে যে, আঠারোর আগে বিবাহ দেওয়া যাবে না, বৈধ কোনো কাজ করা যাবে না; তাহলে এই নিয়মও হওয়া দরকার যে, আঠারোর আগে কোনো ছেলে-মেয়ে কোনো ধরনের অবৈধ কাজও করতে পারবে না। যদি বিবাহের মতো বৈধ কাজ আঠারোর আগে করা না যায়, তবে এই সমাজের মুসলিমদের কাছে আবদার হলো—এরা যেন আঠারোর আগে শরীয়ত-বিরোধী অনৈতিক কাজে না জড়ায়। আঠারোর আগে বিয়ে না করার ব্যাপারে যদি সমাজের উৎসাহ থাকে, তাহলে 'আঠারোর আগে কোনো ছেলে-মেয়ে অবৈধ কাজ করতে পারবে না'—এ ব্যাপারে এই সমাজের আরও বেশি উৎসাহ থাকা দরকার।

সবচেয়ে প্রিয় আমল

এবার মূল আলোচনায় ফিরে যাই। আল্লাহর কাছে দামি সময় শুধু যৌবনকাল। আগেই বলেছি, আল্লাহর কাছে প্রিয় হওয়ার সবচেয়ে বড় আমল নিয়ে কথা বলব, ইনশাআল্লাহ। এরপর আমরা আমাদের জীবনকে এই অনুযায়ী সাজাব।

মানুষ সাধারণত ধারণা করে, আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় আমল হলো নামাজ। কারও ধারণা হলো রোজা। কারও ধারণা হজ। আবার, কারও ধারণা যাকাত। এমন অনেক ধারণা আছে। কিন্তু আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় আমল হলো 'গুনাহমুক্ত জীবন গড়া'। সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে প্রিয় আমল হলো গুনাহমুক্ত জীবন। এই কথাটা আমরা আলোচনা থেকে বোঝার চেষ্টা করব এবং সিদ্ধান্ত নেব যে, আমি আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় হব কি হব না! তো, আল্লাহর কাছে প্রিয় হওয়ার জন্য প্রথমে আমার জীবনকে গুনাহমুক্ত করতে হবে।

আমি যে দাবি করলাম, আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় হওয়ার আমল হলো 'গুনাহমুক্ত জীবন গড়া', এই দাবিটার বাস্তবতা প্রথমে আমাদেরকে বুঝতে হবে। বর্তমান সমাজের ভেতরে অনেক বড় বড় নামাজি পাওয়া যায়। রোজাদার

লোকের অভাব নেই। যাকাত দেয়—এমন লোকও কম নেই। কিন্তু গুনাহমুক্ত জীবন কার আছে—এমন দুই-একজন লোক দাঁড় করিয়ে দিতে বললে যে ফলাফল দেখা যাবে, তা বড় পেরেশানির বিষয় হয়ে দাঁড়াবে।

বলুন তো, আল্লাহ তাআলার কাছে মানুষের মধ্যে সবচাইতে বেশি প্রিয় কে? নবি-রাসূলগণ আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয়। তো, আল্লাহর কাছে নবি-রাসূলগণ কীসের মাধ্যমে প্রিয় হলেন—সেটা বোঝা দরকার। আচ্ছা, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাইতে প্রিয় কোনো ব্যক্তি আছে আল্লাহর কাছে?

না।

তিনি যখন নবুওয়ত পান, তখন তাঁর বয়স হলো চল্লিশ। এরপরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ তাআলা যখন নামাজের বিধান দান করেন, তখন তাঁর বয়স প্রায় পঞ্চাশ। কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে। নামাজ ফরজ হয়েছে তাঁর পঞ্চাশ বছর বয়সে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুনিয়াতে ছিলেন তেষট্টি বছর। তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবনে নামাজ পড়েছেন সর্বোর্চ্চ তেরো বছর। ধরুন, আমাদের ভেতরে কেউ পনেরো বছর বয়সে বালেগ হলো, আর সে হায়াত পেল ষাট বছর। তো, সে যদি পনেরো বছর বয়স থেকে নামাজ পড়া শুরু করে, তাহলে নামাজ পড়বে মোট পঁয়তাল্লিশ বছর। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাজ পড়েছেন তেরো বছর। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, তেরো আর পঁয়তাল্লিশে পার্থক্য অনেক।

দ্বিতীয় কথা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য ফরজ নামাজ ছয় ওয়াক্ত না পাঁচ ওয়াক্ত? পাঁচ ওয়াক্ত। আর আমার ওপর কয় ওয়াক্ত? ঠিক একই পরিমাণ। তাহলে যে লোক পঁয়তাল্লিশ বছর নামাজ পড়েছে, যদি তার পঠিত ফরজ নামাজের সংখ্যা আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফরজ নামাজের সংখ্যা তুলনা করি, তাহলে গাণিতিকভাবে কারটা বেশি হবে? যে লোক পঁয়তাল্লিশ বছর নামাজ পড়েছে, তার ফরজ নামাজের সংখ্যাই বেশি হবে। তাহলে যদি নামাজের সংখ্যার মাধ্যমে আল্লাহর কাছে প্রিয় হওয়ার মাসআলা হয়, তাহলে তো সংখ্যা আপনার বেশি—যদি আপনি পঁয়তাল্লিশ বছর নামাজ পড়েন। কেউ যদি ৬০ বছর ধরে নামাজ পড়ে, তারটা তো আরও বেশি। অবশ্যই তার ফরজ নামাজের রাকআত সংখ্যা, ফরজ রুকুর সংখ্যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাইতে বেশি হবে। এখন যদি নামাজের সংখ্যার দ্বারা কেউ প্রিয় হয়, তাহলে আপনি যেহেতু রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেয়ে বেশি নামাজ পড়েছেন, সেহেতু আপনিই তো অধিক প্রিয় হওয়ার কথা। তাই না?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা বললে হয়তো বলতে পারেন, 'উনি নবি। তাঁর সাথে কি আমাদের উপমা চলতে পারে?' আচ্ছা ঠিক আছে, আল্লাহর নবির কথা বাদ দিলাম। উম্মতের ভেতরে আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় হলেন আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু। তিনি নবিজির উম্মত ছিলেন। ধরে নিন, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাঝে বয়সের পার্থক্য ছিল দুই বছর। তার মানে নামাজ যখন ফরজ হয়, তখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর বয়স আটচল্লিশ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তেষট্টি বছরে মারা গেছেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুও তেষট্টি বছর বয়সে মারা গেছেন। বয়স সমান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার দুই বছর পরে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বিদায় নিয়েছেন। তাহলে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু কত বছর ধরে নামাজ পড়েছেন? পনেরো বছর। সুতরাং, আমাদের মধ্যে যিনি পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে নামাজ পড়েছেন, এখনো পড়ছেন, তিনি তো সংখ্যার দিক থেকে আবু বকরের চেয়ে বেশি নামাজ পড়েছেন।

আমরা মনে করি যে, নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত—এগুলোই কেবল বড় আমল। মনে করতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু আল্লাহর কাছে প্রিয় হওয়ার সবচেয়ে বড় আমল হলো 'গুনাহমুক্ত জীবন গড়া'। আমি উদাহরণ দিয়ে বোঝালাম।

আপনি রোজার কথাই বলুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বোচ্চ এগারো বছর রোজা রেখেছেন। আমাদের ভেতরে যে লোক ৬৫ বছর বেঁচেছে, সে তো প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে রোজা রেখেছে। নবিজির চেয়ে সংখ্যায় তিনগুণেরও বেশি। চার ভাগের একভাগ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবনে একবার হজ করেছেন; আর আমরা অনেকেই আছি, যারা চল্লিশ বারও হজ করেছি। তো, চল্লিশ আর এক কি সংখ্যার দিক থেকে সমান? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে নেসাব পরিমাণ সম্পত্তি কখনোই জমা হয়নি। যাকাত দেওয়ার সুযোগই তিনি পাননি। আর আমরা তো অনেকেই লক্ষ লক্ষ টাকা যাকাত দেওয়ার সুযোগ পাচ্ছি।

এগুলো বোঝার জন্যে বলছি। উম্মতের ভেতরে আজ ভুল ধারণা পয়দা হয়েছে। তারা গুনাহ থেকে মুক্ত থাকার কোনো পরোয়া করছে না। আমি বলছি—এই কথা বুঝতে হবে এই মজলিস থেকে যে, আল্লাহর কাছে প্রিয় হওয়ার সবচেয়ে

বড় আমল হলো গুনাহমুক্ত জীবন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তেরো বছর নামাজ পড়েছেন, এগারো বছর রোজা রেখেছেন, জীবনে একবার হজ করেছেন, যাকাত তাঁর ওপর ফরজ হয়নি কখনো, এরপরেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয়। কারণ, তিনি জীবনে কোনোদিন গুনাহ করেননি। এবং শুধু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম না, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মতো অন্য নবিরাও মাসুম ছিলেন। অন্যান্য নবিরাও তাঁদের জীবনকে গুনাহমুক্ত রেখেছেন। আমি আর আপনি ৪৫ বছর নামাজ পড়লেও, কয়দিন নিজের জীবনকে গুনাহমুক্ত রাখতে পেরেছি? ওই হিসাব কিন্তু নেওয়া হয়নি। এজন্য আমি ৪৫ হাজার দিনও যদি নামাজ পড়ি, ৪৫ হাজার বছরও যদি নামাজ পড়ি, তাহলেও আমার জীবন রাসূলের সাথে মিলবে না। আমি রাসূলের সাথে টেক্কা দেওয়া তো দূরের কথা, রাসূলের সাথে আমার জিন্দেগি মেলালে দেখা যাবে যে, গুনাহ করার কারণে হয়তো আল্লাহর কাছে আমার এক ওয়াক্ত নামাজও কবুল হয়নি। এভাবে সমাজ থেকে গুনাহমুক্ত থাকার ধারণা ছুটে গেছে। পুরো সমাজ এ কথা ভুলে গেছে যে, আল্লাহর কাছে শ্রেষ্ঠ হওয়ার এবং প্রিয় হওয়ার সবচেয়ে বড় আমল হলো গুনাহমুক্ত জীবন গড়া। এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন দেখলেই স্পষ্ট হয়। আমিও যদি আমার জীবনকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মতো করতে চাই এবং তাঁর সাথে জান্নাতে যাওয়ার আশা রাখি, তাহলে আমার জীবনটাকেও গুনাহমুক্ত করতে হবে।

প্রথম দলিল

এবার ব্যাপারটি আরও ভালোভাবে বোঝার জন্য কয়েকটি দলিল পেশ করব। এরপর আমাদের জীবনের হিসাব নেব। আল্লাহ তাআলা কুরআনে একটি সূরা নাযিল করেছেন। সূরাটির নাম হলো সূরা ইউসুফ। এখন তো অনেকেই ইউসুফ-জুলেখা নামের ফিল্ম বের করেছে। আল্লাহ মাফ করুক। এতে ঈমানের খতরা আছে। নবির অবয়ব দেখতে গিয়ে দুনিয়ার বড় বড় লম্পটকে দেখছে মানুষ। নায়করা লম্পট না? তাদের চরিত্র ঠিক আছে? নায়িকার চরিত্র ঠিক আছে? ফিল্ম দেখার কারণে আপনার দিলে এখন নবির নাম শুনলে ওই লম্পটের চেহারা দিলে ভেসে আসে। আসে কি না? নবিরা দুনিয়ার সবচেয়ে বড় মাসুম, আর এই নবির নামে সিনেমা দেখার কারণে দিলের ভেতরে দুনিয়ার লম্পটের ছবি আসছে। তো, ঈমান ঝুঁকিতে পড়ার শঙ্কা আছে কি না? আমরা আমাদের অজান্তে নেক নিয়তে ইউসুফ-জুলেখা দেখে ঈমানকে অনেক বড় করছি, নাকি ছোট করছি? এখন ইউসুফ আলাইহিস সালাম-এর নাম শুনলেই

একজন নায়কের কল্পনা দিলের ভেতর আসে। আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুন। এটা এমনি এমনি বললাম।

আল্লাহ তাআলা কুরআনে সূরা নাযিল করেছেন। সূরার নাম ইউসুফ। আল্লাহ তাআলা এ সূরায় বর্ণিত ইউসুফ আলাইহিস সালামের গল্পের ব্যাপারে একটা কথা বলেছেন। অন্য কারও গল্পের ব্যাপারে এই কথা বলেননি আল্লাহ।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَٰذَا الْقُرْآنَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ

‘আমি তোমার নিকট সুন্দরতম কাহিনি বর্ণনা করছি, এ কুরআন আমার ওহি হিসেবে তোমার কাছে প্রেরণ করার মাধ্যমে। যদিও তুমি এর পূর্বে অনবহিতদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে।’[৪]

আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মহব্বত করে বলছেন, ‘আমি তোমার কাছে আমার সবচেয়ে প্রিয় গল্প শোনাচ্ছি। সবচেয়ে সুন্দর গল্প শোনাচ্ছি।’ আল্লাহ তাআলা ইউসুফ আলাইহিস সালাম-এর বালেগ হওয়ার পরের ঘটনা শুনিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ۚ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ ۖ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ ۖ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ

‘আর যে মহিলার ঘরে সে ছিল, সে তাকে কুপ্ররোচনা দিলো এবং দরজাগুলো বন্ধ করে দিলো, আর বলল, “এসো”। সে (ইউসুফ) বলল, “আল্লাহর আশ্রয় (চাই)। নিশ্চয়ই তিনি আমার রব, তিনি আমার থাকার সুন্দর ব্যবস্থা করেছেন। নিশ্চয়ই জালিমগণ সফল হয় না।”’[৫]

এই লম্বা-চওড়া ঘটনা আল্লাহ বয়ান করছেন যে, ইউসুফ বালেগ হয়েছেন। এই সুন্দর ঘটনা স্বয়ং আল্লাহ তাআলা শোনাচ্ছেন। ইউসুফ আলাইহিস সালাম যাদের ঘরে ছিলেন, ওই ঘরের রমণী একদিন ইউসুফ আলাইহিস সালাম-কে নিজের কাছে ডাকছে। মনে রাখবেন, এই ঘটনা শোনাচ্ছেন আল্লাহ। আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় ঘটনাটা আল্লাহ শোনাচ্ছেন। ওখানে তখন ইউসুফ আলাইহিস সালাম-এর সামনে শুধু এই রমণীই আছে, আর কেউ নেই। এই

[৪] সূরা ইউসুফ, ১২ : ৩।
[৫] সূরা ইউসুফ, ১২ : ২৩।

সময় সে ইউসুফ আলাইহিস সালাম-কে আকর্ষণ করার চেষ্টা করল।

ইউসুফ আলাইহিস সালাম তখন সবেমাত্র বালেগ। তো, ইউসুফ আলাইহিস সালাম-এর মধ্যে আকর্ষণ আছে, নাকি নেই? আছে। আর ওই রমণী এমন জায়গায় ডাকছে, যে জায়গা আল্লাহ ছাড়া আর তৃতীয় কেউ দেখছে না। এই সময় ইউসুফ আলাইহিস সালাম একটা শব্দ বলেছেন, "মাআযাল্লাহ"—হে আল্লাহ! আপনি আমাকে বাঁচান। আমি নিজে বাঁচার ক্ষমতা রাখি না, আমারও তো আকর্ষণ আছে। কিন্তু আমি আপনাকে ভয় করি, আমি এ অবস্থা থেকে বাঁচতে চাই। আল্লাহ বলেন যে—হে ইউসুফ! তোমার ঘটনা আমার সবচেয়ে পছন্দ হয়েছে। কিয়ামত পর্যন্ত কোনো যুবক যদি গুনাহের আহ্বান পাওয়ার পর আমার ভয়ে এইভাবে নিজেকে বাঁচিয়ে নেয়, তাহলে সেটাও আমার কাছে সবচেয়ে সেরা গল্প হবে। আমি ইউসুফকে যেভাবে অমর করে রেখেছি, ওই যুবককেও আমি অমর করে রাখব।

সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ তাআলা তাঁর সবচেয়ে প্রিয় গল্প রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শোনাচ্ছেন। এজন্যে শোনাচ্ছেন, তিনি যেন তাঁর উম্মতকে শোনান। তিনি এই উম্মতের কাছে ইউসুফ আলাইহিস সালাম-এর মতো আদর্শ চান। গুনাহ করার সব সুযোগ ইউসুফ আলাইহিস সালাম-এর সামনে ছিল; কিন্তু আল্লাহর ভয়ে সব আকর্ষণকে বাদ দিয়ে ইউসুফ আলাইহিস সালাম বলছেন, 'মাযাআল্লাহ—হে আল্লাহ! আপনি আমাকে বাঁচান।'

এই-যে আল্লাহ তাআলা তাঁর সেরা গল্প শুনিয়েছেন, এখানে কি ইউসুফ আলাইহিস সালামের এক হাজার বছর নামাজ পড়ার কথা আছে? দুই হাজার বছর? ইউসুফ আলাইহিস সালাম সারাদিন-সারারাত রোজা রাখতেন—এই গল্প শোনানো হয়েছে? কোটি কোটি টাকা যাকাত দিয়েছেন, এইটা শোনানো হয়েছে?

না। আল্লাহ তাঁর পূতপবিত্র চরিত্রের ঘটনা বয়ান করেছেন। এখন যার আকল আছে, সে নিজেকে ইউসুফ আলাইহিস সালাম-এর চরিত্রের ওপর উঠাবে। কার ওপর উঠাবে? ইউসুফ আলাইহিস সালাম-এর চরিত্রের ওপর। ইউসুফ আলাইহিস সালাম-এর গুনাহের অফুরন্ত সুযোগ ছিল, কিন্তু আল্লাহর ভয়ে তিনি নিজেকে গুনাহ থেকে ফিরিয়ে রেখেছেন। এই গল্প আল্লাহর কাছে 'আহসানুল কাসাস' হয়ে গেছে।

বড় নামাজি, কিন্তু গুনাহ থেকে মুক্ত না; বড় রোজাদার, কিন্তু গুনাহে জড়িত; বড় দানবীর, কিন্তু গুনাহযুক্ত জীবন তার; এই জীবনের দাম আল্লাহর কাছে বেশি? না। যে ব্যক্তি হালাল-হারাম বেছে চলে—হোক তার আমল অল্প—তার

দাম আল্লাহর কাছে বেশি। যে ব্যক্তি গুনাহমুক্ত জীবন গড়েছে, তার আমল আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয়।

সমাজ থেকে এটা হারিয়ে গেছে যে, গুনাহমুক্ত জীবন গড়তে হবে। ঈমান আনার পরে গুনাহ করার যে আর সুযোগ নেই—এই কথা সমাজের মানুষ ভুলেই গেছে। সবাই বলছে নামাজ পড়ো, রোজা রাখো, হজ করো, যাকাত দাও। কিন্তু আসল কথা হলো ঈমান আনার পরে সর্বপ্রথম তোমার জিম্মাদারি ছিল, তুমি এই ওয়াদা করো যে, 'আমি আল্লাহর হুকুমের বাইরে চলব না। আমার জীবনকে নবিদের জীবনের মতো বানাব।' নবিরা তো গুনাহমুক্ত জীবন গড়ে মাসুম হয়েছে। তুমি যদি গুনাহ করেও ফেলো, তবে তাওবা করে নিজেকে ক্ষমাপ্রাপ্ত বান্দা বানিয়ে আল্লাহর কাছে চলে যাও।

তাহলে, আমার জীবন যদি নবির সাথে মেলাতে চাই, তাহলে কোন পয়েন্টে সবচেয়ে বেশি মেলাতে হবে? গুনাহমুক্ত জীবন। যদি আমার জীবন আবু বকরের জীবনের মতো করতে চাই, তাহলে কোন পয়েন্টে তাঁকে সবচেয়ে বেশি অনুসরণ করতে হবে? গুনাহমুক্ত জীবন। আল্লাহ তাআলা আমাদের সামনে যে সুন্দর গল্পটা শুনিয়েছেন, ওই গল্পের ভেতর আল্লাহ কী উপস্থাপন করেছেন? গুনাহের সুযোগ ছিল, কিন্তু ইউসুফ আলাইহিস সালাম নিজেকে গুনাহ থেকে ফিরিয়ে রেখেছেন।

দ্বিতীয় দলিল

এই ব্যাপারে আরেকটা দলিল দেবো। আরও অনেক দলিল আছে, শুধু বোঝার জন্য আরেকটা দিচ্ছি। কিয়ামতের ময়দানে সবাই যখন জমা হবে, তো কারও নাক দিয়ে মগজ টপকিয়ে টপকিয়ে পড়তে থাকবে। কেউ হাটু পরিমাণ ঘামের মধ্যে চলতে থাকবে, দাঁড়িয়ে থাকবে। কেউ কোমর পরিমাণ, কেউ গলা পরিমাণ। কেউ হাবুডুবু খেতে থাকবে। ওই সময় আল্লাহ রব্বুল ইযযাত সাত শ্রেণীর লোককে আরশের নিচে জায়গা দেবেন।

আল্লাহ তাআলা নবিদেরকে আরশের নিচে ছায়া দেবেন। নবিদের সাথে আরও সাত শ্রেণীর লোককে আরশের নিচে ছায়া দেবেন। এরা কারা?

এর মধ্যে আল্লাহ প্রথম জনের নাম বয়ান করছেন 'ইমামুন আদিলুন'।

একটি হাদীসে[৬] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে শোনাচ্ছেন, সবার আগে যে ছায়া পাবে, সে হলো ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ। অনেক

[৬] মিশকাতুল মাসাবীহ, ৭০১।

বড় নামাজি বাদশাহর কথা বলা হয়নি। বেশি বেশি নফল রোজা রাখে, এমন বাদশাহ না। কারও ওপর জুলুম করেনি, অন্যায় করেনি, পাপ করেনি—এমন বাদশাহকে আল্লাহ আরশের নিচে ছায়া দেবেন। কারণ সে গুনাহমুক্ত জীবন গড়েছে। বাদশাহ হয়েও গুনাহমুক্ত জীবন গড়ার কারণে আল্লাহ আরশের নিচে ছায়া দেবেন। সুবহানআল্লাহ! আরেকজন হলো, নিজেকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে রেখেছে যে যুবক। এই যুবককে দেখতে সুন্দরী, আকর্ষণ আছে এবং সম্ভ্রান্ত—এমন নারী কাছে পাবার জন্যে ডেকেছে। নিভৃতে নিজের কাছে ডেকেছে। ওই যুবক তখন আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়ে সে ডাক প্রত্যাখ্যান করেছে। সে যুবক থাকবে আরশের ছায়ার নিচে। কারণ, সে গুনাহমুক্ত জীবন গঠন করেছিল। সম্ভ্রান্ত, রূপবতী নারী ডাকার পরেও সে বলছে, 'আমি তো আল্লাহকে ভয় করি।' এই যুবক নিজেকে গুনাহ থেকে ফিরিয়ে নিয়েছে। তাহলে আমি-আপনি যদি এই ধারণা করে বসে থাকি নামাজ, রোজা, হজ, যাকাতও করব, আবার গুনাহও করব—তবে এই জীবন নবির সাথে মিলবে না। আর নবির জীবনের সাথে আপনার জীবন না মেলার কারণে আপনি আল্লাহর আরশের ছায়ায় জায়গা পাবেন না। আপনার জীবন ইউসুফ আলাইহিস সালাম-এর সাথে মিলেনি; আপনার জীবন, যারা আরশের নিচে ছায়া পাবে—তাদের সাথে মিলেনি। কেননা আপনি ভুল ধারণা নিয়ে বসে ছিলেন।

ইবাদতের উদ্দেশ্য

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে নামাজের পরিচয় দিচ্ছেন,

اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

'তোমার প্রতি যে কিতাব ওহি করা হয়েছে, তা থেকে তিলাওয়াত করো এবং নামাজ কায়েম করো। নিশ্চয়ই নামাজ অশ্লীল ও মন্দকাজ থেকে বিরত রাখে। আর আল্লাহর স্মরণই তো সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ জানেন—যা তোমরা করো।'[৭]

দেখুন, নামাজের ভেতর আল্লাহ শেখাচ্ছেন যে, গুনাহমুক্ত জীবন গড়ো। আল্লাহ বলছেন—আমার কাছে ওটা নামাজই না, যে নামাজের নামাজিরা গুনাহ ছাড়তে পারনি। যে নামাজ তোমাকে গুনাহ থেকে ফেরায় না, ওই নামাজ নামাজই না।

[৭] সূরা আল-আনকাবূত, ২৯ : ৪৫।

তাহলে নামাজের উদ্দেশ্য কিন্তু গুনাহমুক্ত জীবন গড়া। নামাজ আর রোজা মানে হলো আল্লাহর এমন ভয় দিলে পয়দা করা, যে ভয়ে আপনি নিভৃতে গুনাহ থেকে বাঁচবেন। এজন্যই রোজাকে ফরজ করা হয়েছে। এবার বুঝেছেন, কেন রোজা ফরজ হলো?

বলুন তো, নামাজ কেন ফরজ? গুনাহ করার জন্য, নাকি গুনাহকে ছাড়ার জন্য? রোজা কেন ফরজ? আল্লাহ নিজে বলছেন—তোমার দিলে এমন ভয় পয়দা করো, যে ভয় দ্বারা তুমি গুনাহের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও নিজেকে ফিরিয়ে রাখবে। এই জন্য আমি রোজাকে ফরজ করেছি।

তাহলে আমরা যে রোজা রাখি, এ রোজার উদ্দেশ্য ঠিক করেছি কি? আমার রোজা যদি আমাকে গুনাহ থেকে না ফিরায়, তাহলে আমার রোজার কী অবস্থা? যাকাতের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলছেন,

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿۱۰۳﴾

‘তাদের সম্পদ থেকে সাদাকা (যাকাত) নাও। এর মাধ্যমে তাদেরকে তুমি পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবে। আর তাদের জন্য দুআ করো, নিশ্চয়ই তোমার দুআ তাদের জন্য প্রশান্তিকর। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।’[৮]

আল্লাহ বলছেন—তুমি যাকাত দাও। যাকাত দিয়ে তাদেরকে পবিত্র করো। তাদের জীবনকে গুনাহ থেকে পবিত্র করো। তাদের মালকে পবিত্র করো।

তাহলে যাকাতের উদ্দেশ্য কি গুনাহমুক্ত জীবন গড়া, নাকি গুনাহযুক্ত জীবন?

এখন আসি হজের কথায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ حَجَّ لِلّٰهِ فَلَمْ يَرْفُثْ، وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

‘যে ব্যক্তি রাফাছ ও ফিসক থেকে বিরত থেকে আল্লাহর উদ্দেশে হজ করল, সে এমন নবজাতক শিশু—যাকে তার মা এ মুহূর্তেই প্রসব করেছে, তার ন্যায় নিষ্পাপ হয়ে ফিরবে।’[৯]

তাহলে হজের মাকসাদ কি গুনাহমুক্ত জীবন গড়া, নাকি গুনাহযুক্ত জীবন?

---

[৮] সূরা আত-তাওবা, ৯ : ১০৩।
[৯] বুখারি, ১৫২১; মুসলিম, ১৮২০।

আমি যে নামাজ পড়ছি, এই নামাজ যদি গুনাহমুক্ত জীবন না গড়তে পারে, যাকাত দ্বারা যদি আমার জীবন গুনাহ থেকে পবিত্র না হয়, হজ দ্বারা যদি আমি নিষ্পাপ না হই, তবে আমার নামাজ, হজ, যাকাত—কোনোটাই আল্লাহর কাছে মাকবুল না। তাহলে আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় হওয়ার আমল কী? গুনাহমুক্ত জীবন গড়া।

কী পরিমাণ গুনাহ ছাড়তে হবে

এখন প্রশ্ন হলো, কী পরিমাণ গুনাহ থেকে মুক্ত জীবন গড়লে আমি মোটামুটি জান্নাতে যেতে পারব?

আমরা তো অনেকে অনেক গুনাহ থেকে মুক্ত। কেউ যিনা করেনি, কেউ মদ খায়নি, কেউ গালি দেয়নি, কেউ গাঁজা খায়নি, কেউ চাঁদাবাজি করেনি, অনেকে আবার টিভিও দেখেনি। অনেকে অনেক গুনাহ থেকেই মুক্ত আছে। তাহলে কয়টা গুনাহ থেকে মুক্ত হলে আমি আল্লাহর কাছে জান্নাতের আশা করতে পারি? আর কয়টা গুনাহ যুক্ত হলে কোনো সমস্যা নেই? এটা জানার বিষয়। প্রথম আমি বুঝেছি যে, আমার জীবন গুনাহমুক্ত হওয়া দরকার। এখন বুঝতে হবে, আমায় কয়টি গুনাহ ছাড়তে হবে?

কুরআন-হাদীস আমাদেরকে এই কথা বলে যে, একটা কবীরা গুনাহ করার পর কেউ যদি তাওবা ছাড়া দুনিয়া থেকে চলে যায়, বা তার তাওবা যদি কবুল না হয়, তবে তাকে জাহান্নামে যাওয়া লাগতে পারে। কয়টা কবীরা গুনাহ? একটা। একটা কবীরা গুনাহও যদি করে আর সেটা থেকে সে যদি তাওবা না করে মারা যায়, তবে সে জান্নাত পাবে না। গুনাহ আর জান্নাত একসাথে জমা হতে পারে না।

আমরা যখনই রাস্তায় বেড়িয়েছি, তখনই যত নাজায়েজ জায়গা আছে, তাকাচ্ছি। ঘরে গিয়ে টিভি দেখছি, স্মার্টফোন দেখছি, এভাবে কানকে গান শুনে নাপাক করছি, দিল নাপাক করছি, সব নাপাক করে দিচ্ছি। তাহলে এখন কয়টা গুনাহ থেকে মুক্ত হতে হবে আমাদেরকে?

বোঝার জন্য একটা ঘটনা বলি। ইবলিস কত হাজার বছর ইবাদত করেছে? এক-দুই বছর? নাকি হাজার হাজার বছর? হাজার হাজার বছর ইবাদত করেছে। ইবলিস আল্লাহর কয়টা হুকুম মানেনি? মাত্র একটা হুকুম মানেনি। আল্লাহ বলেছেন, 'আদমকে সিজদা করো।' সব ফেরেশতারা সিজদা করেছেন। কিন্তু ইবলিস করেনি। ইবলিসকে যদি বলা হতো—'আল্লাহকে সিজদা করো', তাহলে

সে করত না? অবশ্যই করত। সে আদমকে সিজদা করেনি। কারণ, তার কাছ এটা পছন্দ হয়নি। সে ভাবছিল—আমি তো হাজার হাজার বছর আল্লাহর ইবাদত করেছি, এত এত বছর জান্নাতে থেকেছি, আল্লাহ আমাকে বানিয়েছেন আগুন দিয়ে, আর এই আদমকে মাটি থেকে বানিয়েছেন। আগুনের স্বভাব ওপরের দিকে ওঠা। মাটির স্বভাব নিচের দিকে যাওয়া। আমি তাকে সিজদা করব কেন?

তখন আল্লাহ বললেন—তুই জান্নাত থেকে বের হয়ে যা।

এখন বলুন তো, কয়টা গুনাহ করেছিল ইবলিস? মাত্র একটা। সে হাজার হাজার বছর পর্যন্ত ইবাদত করেছে। অথচ একটা গুনাহের কারণে আল্লাহ তাকে জান্নাত থেকে বের করে দিয়েছেন, অভিশপ্ত করেছেন। এখন হিসাব মিলিয়ে দেখুন। জিন্দেগিতে একটাও গুনাহ নেই—এমন কতজন আছেন? আজকে বনী আদম হাজারও গুনাহ করছে, যেমন মন চায় জীবন গড়ছে, যেমনভাবে মন চায় তার জীবনকে সাজাচ্ছে, যেখান থেকে মন চায় খাচ্ছে, যেখানে মন চায় ব্যায় করছে। হাজার হাজার দিন ধরে গান নিয়ে ব্যস্ত, টিভি নিয়ে ব্যস্ত, সব ধরনের অবৈধ কাজ নিয়ে ব্যস্ত, নেশা নিয়ে ব্যস্ত, চাঁদা নিতে ব্যস্ত। আল্লাহর কোনো খবর তার নেই, আল্লাহর কথা সে মনে রাখে না। একটা গুনাহের অপরাধে আল্লাহ তাআলা ইবলিসকে বের করে দিয়েছেন। সে বনী আদমকে সিজদা করেনি। আর এই বনী আদম হাজার হাজার বার গুনাহ করছে। বনী আদমের জিন্দেগি শয়তানের চাইতেও বড় বড় গুনাহে ভরে যাচ্ছে। তাহলে গুনাহমুক্ত যে জীবন গড়তে হবে, সেখানে কি দুয়েকটা গুনাহ বাদ দিলেই যথেষ্ট হয়ে যাবে? নাকি সব গুনাহ বাদ দিতে হবে?

সব গুনাহ।

দুই-একটা গুনাহ করার অনুমতি আছে নাকি?

না, একটা গুনাহ করারও অনুমতি নেই।

এবার অন্য আরেকটি বিষয় ভাবুন। আল্লাহ তাআলা প্রথমে আদম আলাইহিস সালাম আর হাওয়া আলাইহিস সালামকে জান্নাতে রেখেছিলেন। ইবলিস তাঁদেরকে প্ররোচনা দিয়ে নিষিদ্ধ গাছের ফল খাইয়েছে। কারণ, ওর ইচ্ছা ছিল যে, আদম-হাওয়াকে জান্নাত থেকে বের করবে। সে তাঁদেরকে গিয়ে বলল—অবশ্যই আমি সবচেয়ে বেশি কল্যাণকামী। আমার কথা না মানলে পস্তাতে হবে। কিন্তু যদি আমার কথা মানো, তবে আজীবন জান্নাতে থাকতে পারবে, আল্লাহর কাছে থাকতে পারবে। বিশ্বাস করো, আমি তোমাদের ভালো চাই।

অমনি আদম ও হাওয়া দিলে দিলে ভেবেছেন—যাক, একটু খেয়ে দেখি। এতে যদি সারাজীবন আল্লাহর কাছাকাছি থাকা যায়, তবে তো বেশ ভালোই হবে।

আদমের নিয়ত খুবই ভালো ছিল। আল্লাহর কাছে জান্নাতে থাকতে চেয়েছিলেন তিনি। নিয়ত ভালো ছিল; কিন্তু যার ওয়াজ দ্বারা তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন, সেই ওয়ায়েজ ভালো লোক ছিল না। এজন্যই ঝামেলা হয়ে গেছে।

আদম আলাইহিস সালাম একটা ভুল করেছেন, ভুল বুঝেছেন। তিনি আল্লাহর কাছাকাছি থাকার জন্যে অল্প একটু ফল খেয়েছেন। এইক্ষেত্রে তিনি কয়টা হুকুম মানেননি? মাত্র একটা। এক ভুলেই জান্নাত থেকে দুনিয়ায় আসতে হয়েছে। আদম আলাইহিস সালাম দুনিয়াতে এসেছেন, দুনিয়ায় এসে কান্নাজড়িত কণ্ঠে বারবার বলেছেন,

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

‘হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা নিজেদের প্রতি অন্যায় করে ফেলেছি, যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন আর দয়া না করেন, তাহলে আমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।’[১০]

আল্লাহকে ডাকতে ডাকতে, কাঁদতে কাঁদতে দুনিয়ার জমিন ভিজিয়ে ফেলেছেন আদম আলাইহিস সালাম। তিনি শুধু বলছিলেন—হে আল্লাহ! আমি নিজের ওপর জুলুম করেছি। আমি বুঝিনি যে, আমাকে এইভাবে জান্নাত ছাড়তে হবে। আমি নিজের অপরাধকে স্বীকার করছি। যদি আপনি মাফ না করেন, তাহলে আমার জীবনও ইবলিসের মতো বরবাদ হয়ে যাবে। আল্লাহ আমাকে মাফ করুন, আমাকে আবার জান্নাত দিন। তখন আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

‘অতঃপর আদম তার রবের পক্ষ থেকে কিছু বাণী পেল, ফলে আল্লাহ তার তাওবা কবুল করলেন। নিশ্চয়ই তিনি তাওবা কবুলকারী, অতি দয়ালু।’[১১]

অর্থাৎ, আল্লাহ বলছেন—ও আমার বান্দারা, আদমের মতো অনিচ্ছাকৃত ভুল করার পরে, আমার কাছে আদমের মতো তাওবা করো। তাহলে আদমকে আমি যেভাবে জান্নাতের ওয়াদা করেছি, তোমাদেরকেও জান্নাতের ওয়াদা করব। কিন্তু গুনাহ নিয়ে তুমি আমার কাছে আসতে পারবে না। গুনাহমুক্ত জীবন নিয়ে যদি তুমি আমার কাছে আসতে চাও, তাহলে আদম যেভাবে দুআ করেছিল,

[১০] সূরা আল-আরাফ, ৭ : ২৩।
[১১] সূরা আল-বাকারা, ২ : ৩৭।

সেভাবে আমাকে ডাকো। আমি আদমকে কাছে ডেকে নিয়েছি, অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য ক্ষমা করে দিয়েছি। তোমাকেও দেবো। তবে গুনাহ বাকি রাখতে পারবে না। কারণ, জান্নাত আর গুনাহ কোনোদিন একসাথে জমা হতে পারে না। তাই আল্লাহ আদম আলাইহিস সালামকে তাঁর অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য জান্নাত থেকে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

পূতপবিত্র জীবন যারা গড়ছে, যাদের জীবনে একটাও কবীরা গুনাহ নেই, তারাই শুধু জান্নাতে আসতে পারবে; এ ছাড়া আর কেউ পারবে না। ও যুবক, তুমি কি এই ধোঁকায় বসে আছো যে, তুমি প্রেম করবে, টিভি-সিনেমা দেখবে, স্মার্টফোনে অশ্লীল কাজ করবে, হোলির অনুষ্ঠানে যোগ দেবে, বিবাহে গান-বাজনা চালাবে, আবার নিজেকে জান্নাতিও দাবি করবে? রবের কসম! এই দাবি অবাস্তব। শয়তান একটি মাত্র গুনাহের কারণে জান্নাত ছেড়েছে। আর তুমি হাজারও গুনাহ নিয়ে জান্নাতের স্বপ্ন দেখছো? এটা তো অনেক বড় ধোঁকা। এর চেয়ে বড় ধোঁকা আছে আর?

জান্নাতে যাবে কারা?

যারা কবীরা গুনাহকে ছেড়েছে। হ্যাঁ, সগীরা গুনাহ আল্লাহ মাফ করে দেবেন, কিন্তু কবীরা গুনাহ না ছাড়লে, দুনিয়া থেকে মাফ করিয়ে না-নিলে, জান্নাত দেবেন না। আগে জাহান্নামে জ্বলেপুড়ে গুনাহ মাফ হবে, এরপর জান্নাত।

ওয়াজ আমরা অনেক শুনি। কিন্তু ওয়াজ শোনার পরে গুনাহ তো ছাড়ি না। ঘরে বিবি পর্দা করে না, সন্তান দ্বীনি শিক্ষা জানে না, নামাজ জানে না, রোজা জানে না; আর আমি নিজেকে জান্নাতি দাবি করছি! আমার জানাযা এই অবস্থায় হচ্ছে যে, আমার বিবি পর্দা জানে না, আমার মেয়ে পর্দা জানে না। আজীবন আমি টিভি দেখেছি, আমাকে কবর দেওয়ার পরে আমার পরিবার এখন টিভি দেখবে! আর আমি জান্নাতের আশা নিয়ে বসে আছি! আর হুজুর ডেকে দুআ করাচ্ছি, 'অমুক ভাইকে জান্নাতে পাঠিয়ে দাও।' অথচ এই হুজুরেরও জান্নাত নিশ্চিত কি না, জানা নেই। সে আবার কিভাবে আপনাকে জান্নাত দেবে, বলুন?

তাই কোনো গুনাহ বাকি থাকুক—এটা মুমিন কল্পনা করতে পারে না। একটা কবীরা গুনাহও যদি হয়ে থাকে, তবে তাওবা করতে হবে। এই মজলিস থেকেই তাওবা করতে হবে। সে তার মায়ের হক নষ্ট করেছে, বোনের হক নষ্ট করছে, স্বামীর হক নষ্ট করছে, স্ত্রীর হক নষ্ট করছে—সবাইকে তাওবা করতে হবে। যে ব্যক্তি সন্তানকে দ্বীন শেখায়নি, ঘরে টিভির ব্যবস্থা করেছে, সন্তানের হাতে টাচস্ক্রীন মোবাইল তুলে দিয়েছে, সন্তান মোবাইলে আজেবাজে জিনিস দেখছে, সন্তানের জীবন পুরো বরবাদ হয়ে গেছে, তার ছেলে অন্য মেয়ের সাথে ফ্রি

মিক্সিং করে, তার মেয়ে অন্য ছেলের সাথে ফ্রি মিক্সিং করে, অথচ বাবা হয়ে সে কোনো আপত্তি করে না; আবার সে আশা করছে জান্নাতে ঢুকে যাবে!

ইবলিসকে মাত্র একটা গুনাহের কারণে জান্নাত ছাড়তে হয়েছে, আর আমি প্রত্যেক দিন হাজার হাজার গুনাহ করে কিভাবে জান্নাতের আশা করি? আল্লাহ আপনি আমাদেরকে সহিহ বুঝ দান করুন।

তাহলে, আল্লাহর কাছে প্রিয় হওয়ার, নবিওয়ালা জিন্দেগি পাওয়ার সবচেয়ে বড় আমল কী?

গুনাহমুক্ত জীবন। শুধু নামাজ না। নামাজের সাথে গুনাহমুক্ত জীবন। শুধু রোজা না, রোজার সাথে গুনাহমুক্ত জীবন। নামাজের আসল উদ্দেশ্য গুনাহ থেকে বাঁচা, রোজার আসল উদ্দেশ্য গুনাহ থেকে বাঁচা, যাকাতের আসল উদ্দেশ্য গুনাহ থেকে বাঁচা, হজের আসল উদ্দেশ্য গুনাহ থেকে বাঁচা। আর আজকাল লোকেরা নামাজও পড়ে, আবার গুনাহও করে। নামাজ পড়ে, আবার পূজায়ও অংশগ্রহণ করে। নামাজ পড়ে, আবার সিনেমাও দেখে। নামাজও পড়ে, আবার গান-বাজনাও শুনে। নামাজও পড়ে, আবার বেপর্দায়ও চলে। বলেন তো, আমার এই নামাজ আল্লাহর কাছে কবুলযোগ্য নামাজ? আমার এই রোজা আল্লাহর কাছে কবুলযোগ্য রোজা? আমার এই যাকাত আল্লাহর কাছে মাকবুল? আমার এই হজ আল্লাহর কাছে মাকবুল?

সুতরাং, ওয়াদা করুন : 'হে আল্লাহ, আমরা একটা গুনাহ নিয়েও কবরে যেতে চাই না। আজ থেকে আমরা গুনাহমুক্ত জীবন গড়ব। ও আল্লাহ, আপনি আমাদেরকে গুনাহমুক্ত জীবন গড়ার তাওফীক দান করুন। আমাদেরকে বেপর্দা থেকে বাঁচান। আমাদের চোখ ও কানকে হেফাজত করুন। আমাদের দিলকে হেফাজত করুন। আমাদের হারাম খাবার থেকে হেফাজত করুন। আমাদের সন্তানদেরকে দ্বীনের ফরজ পরিমাণ জ্ঞান শেখার তাওফীক দান করুন। ও আল্লাহ, আমাদের বিবিদেরকে যেন পর্দায় রাখতে পারি, সেই তাওফীক দান করুন। আমাদের মেয়েদেরকে যেন সাচ্চা নামাজি হিসেবে গড়তে পারি, সেই তাওফীক দান করুন। আমাদের জীবনকে নবিদের সাথে মিলিয়ে দিন। ইবলিসের সাথে মেলাবেন না। হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে তাওফীক দান করুন।' আমিন।

দ্বীনি রাহবারদের ব্যাপারে সতর্ক হোন

জান্নাতি হতে হলে দ্বিতীয় আবশ্যকীয় বিষয় হলো, পুরো দ্বীনের সাথে জুড়ে থাকা। আর দ্বীনি রাহবার উলামায়ে কেরামের সাথে যুক্ত হওয়া ছাড়া দ্বীন-ঈমানের সাথে জুড়ে থাকা সম্ভব না। তাই সর্বপ্রথম দ্বীনি রাহবারদের ব্যাপারে আমাদের দিলের অবস্থান ঠিক করে নিতে হবে।

আমাদের দিলে দ্বীনি রাহবারদের অবস্থান কেমন হবে?

এখানে, শুরুতেই মনে রাখা জরুরি যে, নবি-রাসূলগণ গুনাহ করেন না। তাঁদের কোনো গুনাহ নেই, তাঁরা মাসুম (নিষ্পাপ)। এবং নবি-রাসূলদের ব্যাপারে এই আকীদা পোষণ করা ঈমানের অংশ। সেইসাথে এই বিশ্বাস রাখাটাও অত্যন্ত জরুরি যে, নবি-রাসূল ছাড়া বাকি যারা দুনিয়াতে আছেন, চলে গিয়েছেন, কিয়ামত পর্যন্ত আসবেন—তারা গুনাহ করতে পারেন। সাহাবায়ে কেরামও গুনাহ করতে পারেন, তবে আল্লাহ তাআলা সাহাবায়ে কেরাম ﷺ-কে মাফ করে দিয়েছেন, সেটা ভিন্ন বিষয়। কিন্তু বাকি লোকদেরকে আল্লাহ তাআলা মাফ করেছেন কি না, আমরা জানি না। সুতরাং, নবি-রাসূল ছাড়া সবাই গুনাহ করতে পারেন।

হুজুররাও ভুল করতে পারে

এখন প্রশ্ন জাগতে পারে, কেন এই বিশ্বাস রাখা জরুরি? তার কারণ হলো, সম্মানিত আলিম-উলামা হলেন নবিদের উত্তরাধিকারী। অনেকে আলিম-উলামাদের দ্বারা কোনো গুনাহ হতে দেখলে সহজে মেনে নিতে পারে না, এ মন্তব্য করে বসে, 'উনার মতো আলিম এমন কাজ করতে পারেন!' এভাবে মনের ভেতর বহু আজেবাজে চিন্তা দানা বাঁধতে থাকে। এক পর্যায়ে ওই আলিমের কাজের ছুতো দিয়ে দ্বীনকেই ছেড়ে দেয়। এ ধরনের আজেবাজে কিছু একটা ভেবে দ্বীনকে ছেড়ে দেওয়া মারাত্মক ঈমান-বিরোধী বিষয়।

আল্লাহ তাআলা নবি-রাসূলদেরকে মাসুম বানিয়েছেন, নিষ্পাপ বানিয়েছেন—এটা মানা আমাদের ঈমানের অংশ। নবি-রাসূল ছাড়া আর অন্য কারও ব্যাপারে নিষ্পাপ হওয়ার ধারণা করা শরীয়তে জায়েজ নেই। সুতরাং, কেউ গুনাহ করলে সেটাকে অস্বাভাবিক মনে করার কিছু নেই। যে গুনাহ করে, সেও আমার মতোই মানুষ। এই যুগের উলামায়ে কেরাম যেমন মানুষ, আমরা সাধারণরাও তেমনই মানুষ। আমরা যেমন কোনো ভুল-ত্রুটির ঊর্ধ্বে না, তেমনইভাবে উলামায়ে কেরামও কোনো ভুল-ত্রুটির ঊর্ধ্বে না। বিষয়টি শুধু এই যুগ না; বরং সব যুগের জন্যই স্বীকৃত। একমাত্র নবি-রাসূলগণই নিষ্পাপ এবং সকল ভুল-ত্রুটির ঊর্ধ্বে, কিন্তু আমরা নই। আমাদের দ্বারা যেসব ভুল হয়; নেককার বান্দা-সহ সম্মানিত আলিম-উলামাদের থেকেও সেসব ভুল হতে পারে।

আমাদের সমস্যা হলো, নিজে নামাজ না পড়লে কোনো কিছু মনে করি না। কিন্তু ইমাম সাহেব যদি নামাজে একটু হেলা করে, তবে সেটা নিয়ে পেরেশান হয়ে যাই। ওই ইমাম সাহেবের চাকরিই থাকে না। অথচ, ইমাম সাহেবের ওপর নামাজ যেমন ফরজ, আমাদের জন্যও তেমনই ফরজ। ইমাম সাহেব সর্বোচ্চ শুদ্ধ করে কিরাআত পড়লেও যেন আমাদের হয় না। ইমাম সাহেব হাফিয কি না—সেটার খবর নিই। তিলাওয়াতের সুর সুন্দর কি না, যাচাই করি। কিন্তু এইদিকে আমি যে পবিত্র কুরআনের দুইটা অক্ষরও শুদ্ধ করে উচ্চারণ করতে পারি না, সেই ব্যাপারটাকে কোনো গুরুত্বই দিই না। অথচ, নামাজে শুদ্ধ কিরাআত পড়া ইমাম সাহেবের জন্য যেমন ফরজ, মুসল্লির জন্যও ফরজ। পবিত্র কুরআনের বিশুদ্ধ তিলাওয়াত জানা যেমন ইমাম সাহেবের জন্য ফরজ, তেমনই আমাদের জন্যও ফরজ।

যা-ই হোক, নবি-রাসূল ছাড়া সবারই বড় বড় গলদ হতে পারে এবং গুনাহ করতে পারে। এটা মানা জরুরি। না মানলে তার পরিণতি হিসেবে শয়তান আমাদের দোষগুলো আমাদের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখবে, আর অন্যের দোষ খোঁজার ভেতরে আমাদেরকে ব্যস্ত করে দেবে। আল্লাহ মাফ করুন!

গুনাহ কিংবা ভুলের ক্ষেত্রে কেউ অনুসরণযোগ্য না। কিন্তু তাই বলে উক্ত গুনাহকারী ব্যক্তির জীবনের সহিহ সব বিষয়গুলো, সঠিক বক্তব্যগুলো একেবারে বরবাদ হয়ে যাবে—এমন ভাবাটাও ভালো না। ধরুন, কোনো ইমাম সাহেবের সাথে আপনার ভালো সম্পর্ক। আপনি খেয়াল করে দেখলেন যে, ইমাম সাহেব টিভি দেখে বা খেলা দেখে বা স্মার্টফোনে নাটক-সিনেমা দেখে। এখন আপনি যদি সারা এলাকা সরগরম করে প্রচার করে বলেন যে, 'আরে! ওই ইমাম সাহেব তো বয়ানে সেদিন একটা কথা বলে দিলেন যে, টিভি দেখা নাজায়েজ;

অথচ উনি তো দেখি নিজেই টিভি দেখেন।' এখন পরবর্তীকালে আপনি আপনার সাথি-সহ অন্যদেরকে টিভি দেখার বৈধতার দলিল দিচ্ছেন—সেই ইমাম সাহেবের টিভি দেখার ওপর ভিত্তি করে। ইমাম সাহেব খেলা দেখে; এখন আপনিও খেলা দেখছেন আর ভাবছেন যে, 'আরে! হুজুরই তো খেলা দেখে; সুতরাং আমার জন্য খেলা দেখাটা কোনো অন্যায় নয় এবং আমার সাথে সাথে অন্যদের খেলা দেখাটাও কোনো অন্যায় না।'

এখানে সমস্যাটা কোন জায়গায় হয়েছে? আমরা মূলত সেই ব্যাপারটি ভুলে গিয়েছি যে, হুজুররাও ভুল করতে পারে। এও ভুলে গিয়েছি যে, 'ভুলের ক্ষেত্রে হুজুরকে মানা যায় না'। কিন্তু হুজুরের ওই বক্তব্য সম্পূর্ণ কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী যে, টিভি দেখা নাজায়েজ। কারণ, টিভিতে বেপর্দা নারীরা আসে; সুন্দরী নারী-সহ অসুন্দর নারীরাও সুন্দরীর বেশ ধরে টিভিতে আসে মানুষকে নিজের দিকে আকর্ষণ করার জন্য। এজন্য টিভি দেখা নিষেধ। কুরআন-হাদীসের দলিল দিয়ে হুজুর সে কথাই প্রমাণ করেছেন। এখন হুজুর যদি সেটা না মানেন, ভুল করেন—তার অর্থ কি এই যে, কুরআন-হাদীসও ভুল হয়ে যাবে? শয়তান আমাদেরকে কুরআন-হাদীসের দলিলগুলো ভুলিয়ে দিয়ে, আমাদের সামনে 'হুজুর'কে মানদণ্ড হিসেবে স্থাপন করে দিয়েছে। যার কারণে হুজুরের বউ বেপর্দা চললে আমরাও মনে করি যে, 'আমাদের বউ পর্দা না করলে সমস্যা কোথায়!' আমরা এইসব সমস্যায় জড়িয়ে যাওয়ার ওই একটাই কারণ—আমরা ভুলে গিয়েছি যে, হুজুররাও ভুল করতে পারেন; যেভাবে আমরা ভুল করতে পারি।

এখানে মনে রাখতে হবে, ভুলের ক্ষেত্রে আমরা কাউকে মানব না। কারও ভুল কাজকে আমরা দলিল বানাতে পারি না। যদিও শয়তান এগুলোকে আমাদের সামনে দলিল হিসেবে উপস্থাপন করে। যেমন, একজন ডাক্তার আর রোগীর মধ্যে ব্যবধান হলো, ডাক্তার চিকিৎসাশাস্ত্র নিয়ে দীর্ঘ একটা সময় পড়াশোনা করেছে। আর এজন্যই যখন আমাদের কারও কোনো রোগ হয়, তখন আমরা ডাক্তারের কাছে যাই—যাতে সমাধান পাওয়া যায়। হঠাৎ ওই ডাক্তার কোনো ভুল করল, তার মানে কি এই যে, ওই ডাক্তারের পুরো জীবনের অর্জিত চিকিৎসাবিদ্যা সব বাতিল? কোনো ডাক্তার ভুল করে না? যত বড় ডাক্তারই হোক না কেন, ভুল করে না এমন ডাক্তার কি আছে? জীবনের অনেকটা সময় নিয়ে কোনো ডাক্তার শরীরের সামান্য একটা অংশ (ধরুন, চোখ) নিয়ে পড়ালেখা করেছে; কিন্তু অপারেশন করতে গিয়ে এমন ডাক্তারের ভুল হয় না? এখন কি ওই ডাক্তার তার ভুলের কারণে আজীবনের জন্য নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছে? নাকি ডাক্তার তার পদেই বহাল আছে? শুধুমাত্র ভুল যেটা হয়েছে—সেটাকে

ভুল হিসেবে ডাক্তারও মানে এবং অন্যরাও মানে। আর সেই জায়গায় একজন আলিমের বিষয়টা তো এমনই। একজন আলিম তাঁর জীবনের দীর্ঘ একটা সময় ইলম অর্জনের পেছনে ব্যয় করেছে এবং সে অনুযায়ী তাঁর জীবনটা সাজাতে গিয়ে কোনো একটা ভুল করে ফেলেছে, তখন আমাদের ভেতর কেন এমন বিস্ময় আসে যে, 'এই আলিম এমন ভুল করতে পারল!' অবশ্যই ভুল করতে পারে। একজন ডাক্তারের যেমন ভুল হয়, সেখানে সমগ্র দ্বীন তো ডাক্তারি পড়াশোনার অনেক বড় ও বিস্তৃত বিষয়—যা হলো সম্পূর্ণ জীবনের সমাধান, কিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত কিছুর সমাধান। তো আলিমের ভুল হওয়াটা কি সেখানে অবাস্তব কিংবা অসম্ভব কোনো বিষয় হতে পারে? কিন্তু, শয়তান আমাদের অন্তরে প্রোথিত করে দিয়েছে যে, আলিমরা ভুল করতে পারেনই না। আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুন।

সুতরাং, মূল কথা এই যে, নবি-রাসূলগণ নিষ্পাপ। তাঁরা ভুল করতে পারেন না, তাঁরা গুনাহ করেন না। নবি-রাসূল ছাড়া আর বাকি সবাই অন্যায় করতে পারে। তবে ভুলের ক্ষেত্রে কেউ অনুসরণযোগ্য নয়—এটা খুব স্বাভাবিক বিষয়। তাদের অন্যায় করার কারণে আমরা সেগুলোকে কখনো দলিল হিসেবে পেশ করব না। একইসাথে তাদের কোনো ভুল বা গুনাহের দরুন তাদের পুরো জিন্দেগিকে একদম বরবাদ বলে মনে করব না, প্রশ্নবিদ্ধ করব না।

আমাদের প্রান্তিকতা

এবার আসা যাক মূল প্রসঙ্গে। আমাদের মাঝে দুই ধরনের প্রান্তিকতা রয়েছে।

- **এক.** আলিমদেরকে নবিদের মতো নিষ্পাপ মনে করা।
- **দুই.** সামান্য ভুল দেখলেই তাঁদের পুরো জীবনের কীর্তিকে অবমূল্যায়ন করা।

আপনি প্রশ্ন করতে পারেন, 'এতে সমস্যা কোথায়?' আমরা এর উত্তরে বলব, একজন ঈমানদারের মূল সমস্যা এখানেই। এ ধারণাকে পুঁজি করে শয়তান সাধারণ মানুষকে দ্বীন থেকে সরিয়ে দেয়। প্রথমে আলিম-উলামাদের থেকে সরায়, এরপরে ধীরে ধীরে দ্বীন থেকেই সরিয়ে ফেলে।

এবার বিষয়টি বিস্তারিতভাবে আপনাদের সামনে তুলে ধরছি।

কোনো মানুষ একাকী বাঁচতে পারে না। অর্থাৎ, পরিবার-সমাজ ইত্যাদি সবকিছু ছেড়ে সম্পূর্ণ একক অবস্থান গ্রহণ করা একজন মানুষের জন্য খুব কঠিন। এজন্য শরীয়ত নির্ধারণ করে দিয়েছে যে, মুসলিমরা কোনো নেতৃত্বের অধীনে চলবে;

অর্থাৎ জামাআতবদ্ধভাবে মুসলিমরা চলবে। কারণ, জামাআতবদ্ধভাবে চললেই মুসলিমদের জন্য দ্বীন-ঈমান নিয়ে বাঁচা সহজ; অন্যথায় দ্বীন-ঈমান নিয়ে বেঁচে থাকা কষ্টকর। দ্বীন-ঈমানের সাথে জুড়ে থাকার জন্যই মুসলিমদেরকে কোনো নেতৃত্বের অধীনে থাকা অনেক জরুরি। আর, মুসলিমরা মূলত দুই নেতৃত্বের অধীনে ইসলামের সাথে লেগে থাকে।

- **এক**. মুসলিমদেরকে পরিচালনার জন্য যদি আল্লাহর প্রতিনিধি তথা খলিফাতুল মুসলিমীন থাকে—যাদের অধীনে মুসলিমদের সমস্ত শাসনভার ন্যস্ত থাকে, তখন এই সকল আয়িম্মা বা নেতৃস্থানীয় লোকের মাধ্যমেই মুসলিমরা ইসলাম, ঈমান, জান-মাল-সহ সবকিছুর নিরাপত্তা নিয়ে পুরোপুরি মজবুতির সাথে টিকে থাকে।
- **দুই**. যদি ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং নেতৃত্ব না থাকে বা নেতৃস্থানীয় লোকেরা ইসলামের নেতৃত্ব না দেয় বা ইসলাম ও মুসলিমদের হালত তাদের সামনে না থাকে, তখন মুসলিমদের দ্বীন-ঈমান সাধারণত টিকে থাকে আলিম-উলামাদের সাথে জুড়ে থাকার মাধ্যমে।

আর যদি এই দুই নেতৃত্ব একসাথে মিলে ইসলামকে এগিয়ে নেয় অর্থাৎ যদি উলামায়ে কেরাম থাকে এবং খলিফাতুল মুসলিমীনও থাকে—যারা দুনিয়ায় আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব করবে, ইসলামি রাজত্ব কায়েম করবে, তখন ইসলাম ও মুসলিমদের গায়ে আঘাত দেওয়ার মতো কেউ থাকে না। ইসলাম ও মুসলিমরা তখন সবার ওপরে থাকে। ইসলামের ওপরে তখন আর কোনো কিছু থাকে না। এটি হলো ইসলামের বিজয়ী অবস্থান। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ তাআলা পাঠিয়েছেন দ্বীনকে এই অবস্থানে পৌঁছানোর জন্য, যেখানে যাদের হাতে ক্ষমতা থাকবে, তাঁরা দ্বীন-ইসলাম ও মুসলিমদেরকে নিয়ে একসাথে চলবে; এবং উলামায়ে কেরাম যারা, তাঁরাও দ্বীন-ইসলাম নিয়ে চলবে। এই দুই অবস্থান যদি সমাজ আর রাষ্ট্রের ভেতরে থাকে, তখন এটা হলো ইসলামের প্রকৃত অবস্থা এবং ইসলামের সর্বোচ্চ দাবি।

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনের সূরা সাজদায় গুরুত্বপূর্ণ এক আয়াতে 'মানুষ দ্বীন-ঈমান নিয়ে কিভাবে চলবে'—সেটার অবস্থান উদাহরণ দিয়ে আমাদেরকে বুঝিয়েছেন। মূসা আলাইহিস সালাম দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার পরে সাধারণ মানুষজন দ্বীন-ঈমান নিয়ে কিভাবে চলেছিল, আল্লাহ তাআলা সেটা বর্ণনা করেছেন।

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا ۖ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ٢٤

‘আর আমি [মূসার পরে] তাদের (বনী-ইসরাঈলিদের) মধ্যে কিছু লোককে ইমাম হিসেবে নির্ধারণ করে দিই [এটা আল্লাহ তাআলার রীতি, আল্লাহই ইমাম নির্ধারণ করে দেন]—যারা আমার নির্দেশ অনুসারে দ্বীন-ঈমান নিয়ে চলবে এবং মানুষকে পথ প্রদর্শন করবে [অর্থাৎ মানুষ যাদের কথা মোতাবেক দ্বীন ঈমান নিয়ে চলবে] এবং তারা আমার আয়াতসমূহে গভীর বিশ্বাস রাখবে।’[১২]

এখন, দ্বীন-ঈমানের পথে মানুষকে চালাতে দুটি যোগ্যতা বা শর্ত লাগবে।

- **১) সবর করতে হবে অর্থাৎ আয়িম্মাদেরকে দ্বীন-ইসলামের ব্যাপারে মজবুত অবস্থান গ্রহণ করতে হবে এবং তার ওপর দৃঢ় থাকতে হবে।**

মানুষ ফিতরাতগতভাবেই আল্লাহর প্রতি অনুরাগী, দ্বীনের প্রতি অনুরাগী। অর্থাৎ দ্বীনকে মানুষ ভালোবাসে এবং আল্লাহকে সর্বাবস্থায় পেতে চায়। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর কথা বলে, তার পক্ষে মানুষের সমর্থন থাকবে—যার ফলে বিপরীত পক্ষ বা ক্ষমতার মালিক ওইসব লোকদের দ্বারা নিজেদের অস্তিত্বের আশঙ্কাবোধ করবে। অর্থাৎ, সমাজে যেসব আলিমদের জনপ্রিয়তা বেশি এবং মানুষের অন্তরে যাদের জন্য মহব্বত-ভালোবাসা প্রকট, সেসব আলিমরা যদি রাষ্ট্রের ক্ষমতাধর শ্রেণীর বিরুদ্ধে অবস্থান নেন, তখন রাষ্ট্র ওইসব আলিমদেরকে নিজেদের জন্য হুমকি মনে করে। তাই তাঁদেরকে সব বিপদ-বাধা উপেক্ষা করে, ধৈর্য বা সবর অবলম্বনের মাধ্যমে দ্বীনের ওপর অটল থাকতে হয়।

- **২) দুনিয়ার কোনো চাওয়া-পাওয়া আয়িম্মাদের মাঝে একদমই থাকতে পারবে না এবং তাঁদের সমস্ত আস্থা-বিশ্বাস আল্লাহর সকল নিদর্শন ও আল্লাহর পবিত্র বাণীর ওপরে থাকবে।**

অতএব উল্লিখিত আয়াত থেকে বোঝা যায়, যাদের মাঝে এ দুই যোগ্যতা আছে, সাধারণ মুসলিম তাঁদেরকে মেনে চলবে; যদিও ক্ষমতা তাঁদের হাতে না থাকে বা মুসলিমরা ইসলামি নেতৃত্বশূন্য হয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন থেকে বিষয়টি মিলিয়ে নিই।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনের দুটো অংশ—মাক্কি ও মাদানি। মাক্কি জীবনে ক্ষমতা ছিল মুশরিকদের হাতে; কিন্তু মুসলিমরা যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তাঁরা জুড়ে ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে।

---

[১২] সূরা সাজদাহ, ৩২ : ২৪

জুড়ে থাকার অর্থ

দ্বীনের সাথে জুড়ে থাকার মানে হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গী হওয়া। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুপস্থিতিতে দ্বীনি রাহবারদের সাথে জুড়ে থাকা। মক্কাতে যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তাওহীদের ডাকে, ঈমানের ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন, তাঁরা প্রত্যেকেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সোহবত প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে দারুল আরকামে মিলিত হতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে খুঁজলে ওখানে পাওয়া যেত। এটাকেই বলে জুড়ে থাকা। সাহাবাগণ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছায়ার মতো থাকতেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রঙে নিজেকে সাজাতেন। সেজন্যই তো একবার এক আরব লোক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এক মজমায় উপস্থিত হয়ে সবাইকে একই বেশভূষায় দেখে বলতে বাধ্য হয়েছিলেন—'আইয়্যুকুম মুহাম্মাদ' (আপনাদের মধ্যে মুহাম্মাদ কে?)।[১৩]

এটাকেই বলে জুড়ে থাকা। বছরে একদিন কোনো আলিমের বয়ান শুনলাম কিংবা মাসে একবার কোনো আলিমের মজলিসে গেলাম—এর মানে জুড়ে থাকা নয়, ওয়াল্লাহি! ইসলামের সাথে যেভাবে জুড়ে থাকতে হয়, তা শুধু ওয়াজ-বয়ান শুনে হয় না, দুয়েকটা মজলিসে গেলেই হয় না; বরং সবকিছু দিয়ে, প্রয়োজনে সবকিছু ত্যাগ করে বাস্তবে আমলের ময়দানে থাকতে হয়।

একটি উদাহরণ। মাঠ পর্যায়ের নেতা যারা থাকে, তাদের ডাকে যেসব কর্মীরা তেমন একটা সাড়া দেয় না, নেতাদের সুখে-দুঃখে সব সময় পাশে থাকে না, তাদেরকে সেই নেতা কি কখনো কর্মী হিসেবে মেনে নেয়? মানে না। এই বিষয়টি দুনিয়ার ক্ষেত্রে ঠিকই বুঝি, কিন্তু দ্বীনের ক্ষেত্রে একদমই বুঝি না। বাৎসরিক একটা ওয়াজ-মাহফিলের আয়োজন করার পর এমন কাউকে ডাকলাম—যার কণ্ঠ সুন্দর; কিন্তু ইলম আছে কি নেই, তা দেখলাম না। আর আত্মতৃপ্তি নিয়ে বললাম, 'আমি দ্বীনের একজন একনিষ্ঠ কর্মী।' ইমাম সাহেবের পেছনে ৫ ওয়াক্ত নামাজ পড়লাম আর মাঝেমধ্যে সালাম-মুসাফাহা করলাম—এগুলোর মানে জুড়ে থাকা নয়।

আলিমদের সাথে জুড়ে থাকার অর্থ হলো : নিজের জীবনের প্রত্যেকটি কাজ, কথা, মুআমালাত, মুআশারাত, নিজের প্রত্যেকটি সকাল-সন্ধ্যা, উঠাবসা-সহ সকল মুহূর্ত শরীয়ত অনুযায়ী হচ্ছে কি না—তা বোঝার জন্য একজন আলিমের সাথে সম্পর্ক করা এবং তাঁর পরামর্শে চলা। কারণ যেখানে ইসলামি

[১৩] বুখারি, ৬৩

শাসনব্যবস্থা নেই, সেখানে দ্বীন নিয়ে অন্তত পক্ষে টিকে থাকার মাধ্যম হলো উলামায়ে কেরাম। আর টিকে থাকার রূপ কী, তাও পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। মূলত, কোনো জীবনাদর্শ অন্তরের ভেতর পুরোপুরি প্রবেশ করানোর জন্য, ওই জীবনাদর্শ লালনকারী কারও সঙ্গে জুড়ে থাকা ছাড়া উপায় নেই। ব্যবসায়ী কারও সাথে থাকলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ব্যবসার প্রতি এক ধরনের অনুরাগ আসে। খেলাধুলা বা গেইমসে আসক্ত কোনো ব্যক্তির সাথে থাকলে ধীরে ধীরে অন্তরে খেলার প্রতি আসক্তি পয়দা হয়। যার নারীর প্রতি আসক্তি বেশি—এমন ব্যক্তির সাথে কেউ থাকলে তারও নারীর প্রতি আসক্তি অবশ্যই তৈরি হবে। তেমনই কোনো হক্কানী-রব্বানী আলিমের সঙ্গ অবলম্বন করলে দ্বীনিয়াত, ঈমানিয়াত অন্তরে প্রবেশ করবে, দ্বীনের ওপর চলার জন্য ব্যক্তি উদ্বুদ্ধ হবে। এবং আলিম-উলামা পবিত্র কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী জীবনকে যতটুকু সাজায়, কমপক্ষে ততটুকু সেও সাজাবে; আলিম-উলামাদের মতো কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী জীবন চালানোর চেষ্টা অন্তরে জাগবে।

যা-ই হোক, মাক্কি যুগে মুসলিমদের হাতে ক্ষমতা ছিল না। মুসলিমরা সেসময় সর্বাবস্থায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে জুড়ে থাকত। আর মাদানি যুগে ইসলামি খিলাফতও ছিল এবং তার সাথে মুসলিমদের দ্বীন-ঈমানের জিম্মাদারির দায়িত্ব ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর; এই দুটো একত্রে মিলে ইসলামের পূর্ণতা এসেছে। আর ইসলাম যখন পরিপূর্ণ হলো, তখন অবস্থা এমন যে, নেতৃত্ব ইসলামের হাতে; জ্ঞান-বিজ্ঞানের নামে যত শিক্ষা আছে—সবকিছু তখন ওহির শিক্ষার অনুগামী। এটাই ইসলামের বিজয়ী অবস্থা। এটা ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনের দুটি পাঠ। কিন্তু তিনি নিষ্পাপ; আর ইসলামের এই নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ তথা আলিমদেরকে নিষ্পাপ মনে করার কোনো অবকাশ নেই। কারণ তাঁরা নবি-রাসূল নন। তাঁরা ভুল করতে পারেন, গুনাহ করতে পারেন। নিশ্চয়ই ভুলের ক্ষেত্রে কেউ অনুসরণীয় নয়; তবে তাই বলে কিছু ভুলের জন্য তাঁদের জীবনের সঠিক সব বিষয়গুলো একদম ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করাটাও সমীচীন নয়। আল্লাহ আমাদেরকে সহিহ বুঝ দান করুন, আমিন।

এতক্ষণ আলোচনার ফলাফল হলো, বর্তমানে আমরা দ্বীন নিয়ে টিকে থাকতে হলে আলিমদের সঙ্গ ছাড়া সম্ভব না। তবে আলিমগণ ত্রুটির ঊর্ধ্বে নন; তাই তাঁদেরকে নবিদের মতো নিষ্পাপ মনে করার সুযোগ নেই। ভুল তাঁরা করতেই পারেন। আমরা ভুলের ক্ষেত্রে তাঁদের অনুসরণ করব না।

খবরদার, এমন যেন না হয় যে, দুয়েকটি ভুল পেলেই তাঁদের সঙ্গ ত্যাগ করে

ফেলি। তাহলে কিন্তু আমরা শয়তানের সহজ শিকারে পরিণত হব। তাই সামনে আলোচনা করা হবে, শয়তান কোন কৌশলে আমাদেরকে আলিমদের থেকে দূরে সরিয়ে শেষ পর্যন্ত দ্বীন থেকেই সরিয়ে ফেলে।

দূরে সরানোর শয়তানি ফাঁদ

পূর্বে আমরা আলোচনা করেছি যে, আমাদের দুনিয়াতে দ্বীন ও ঈমানের সাথে টিকে থাকার জন্য, যারা দ্বীনের নেতৃত্বে থাকেন—তাঁদের সাথে জুড়ে থাকা আবশ্যক। দ্বীন-ঈমান নিয়ে পুরোপুরি টিকে থাকার জন্য 'দুই নেতৃত্ব'-এর হাত জরুরি। এক হলো, যাদের হাতে প্রশাসনিক ক্ষমতা আছে; আরেক হলো, যারা দ্বীন নিয়ে চলেন, দ্বীনের নেতৃত্বে যারা আছেন, অর্থাৎ উলামায়ে কেরাম।

প্রশাসনিক ক্ষমতায় যারা আছে, তারা যদি দ্বীনদার না হয়, তাহলে উলামায়ে কেরাম যারা আছেন, তাঁদের সাহায্যে সাধারণ মানুষ দ্বীন নিয়ে টিকে থাকে। আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টিগতভাবে দ্বীন নেওয়ার যোগ্যতা দিয়ে বানিয়েছেন।

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেনঃ প্রত্যেক নবজাতকই ফিত্‌রাতের উপর জন্মলাভ করে। অতঃপর তার পিতামাতা তাকে ইয়াহূদী, নাসারা বা মাজূসী (অগ্নিপূজারী) রূপে গড়ে তোলে। যেমন, চতুষ্পদ পশু একটি পূর্নাঙ্গ বাচ্চা জন্ম দেয়। তোমরা কি তাকে কোন (জন্মগত) কানকাটা দেখতে পাও? অতঃপর আবূ হুরায়রা তিলাওয়াত করলেনঃ

فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ۚ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ ۙ

(যার অর্থ) "আল্লাহর দেয়া ফিত্‌রাতের অনুসরণ কর, যে ফিত্‌রাতের উপর তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন, এটাই সরল সুদৃঢ় দ্বীন"।(সূরা রুম, আয়াত ৩০)[১৪]

এখন উলামায়ে কেরাম যারা আছেন, দ্বীনি নেতৃত্বে যারা আছেন, তাঁদের থেকে সাধারণ মানুষকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য যুগে যুগে যে কার্যকরী অস্ত্র প্রয়োগ

[১৪] সহিহ বুখারী, ১৩৫৯
হাদিসের মান : সহিহ হাদিস

করা হয়েছে তা হলো, তাঁদের চারিত্রিক বিষয়ে আঘাত দেওয়া। তাঁদের দুয়েকটি দোষ-ত্রুটি খুঁজে বের করা। এরপর তা সাধারণ মানুষের সামনে প্রচার করে দেওয়া। সাধারণ মানুষের তবিয়ত হলো, কোনো আলিমের নামে দোষ-ত্রুটি শুনলে, যাচাই-বাছাই ছাড়াই তা বিশ্বাস করে নেয়। আলিমদের সঙ্গ ছেড়ে দেয়, এরপরে দ্বীন থেকে সরে যায়। এভাবে শয়তান সফল হয়ে যায়।

অপপ্রচার

এর দলিল হিসেবে বুখারি শরীফের একটি ঘটনা পেশ করছি। ঘটনাটি বলার উদ্দেশ্য হলো একটা বিষয় বোঝানো। সেটা হলো—যাদেরকে মানুষ বুজুর্গ, নেককার, আল্লাহওয়ালা মনে করে এবং ভালোবাসে, যখন তাঁদের বিরুদ্ধে কোনো অপপ্রচার হয়, তখন যতটা ভালোবাসত, ঠিক ততটা ঘৃণা করা শুরু করে। তাঁদের থেকে বিপরীত দিকে ছোটা শুরু করে। এ কথা ভুলে যায়, তাঁরাও আমাদের মতো মানুষ। ভুল তো আমাদেরও হয়।

আমাদের স্ত্রীরা গুনাহ করলে আমরা কি তাদেরকে সাথে সাথে তালাক দিয়ে দিই? না, দিই না। তদ্রূপ, স্বামী গুনাহে জড়িয়ে পড়লে স্ত্রী কি সাথে সাথে স্বামীকে ত্যাগ করে? ছেলে গুনাহ করলে বা অবাধ্য হলে কি বাবা সাথে সাথে ছেলেকে ছেড়ে দেয়? নাকি বাবা গুনাহ করলে ছেলে সাথে সাথে বাবাকে ত্যাগ করে? কিন্তু কেউ যদি দ্বীনের কারণে কাউকে ভালোবাসে, আর যদি তার নামে উলটাপালটা কিছু শোনে, তখন ভালো করে তাহকিক না করেই, ঠিক যতটা ভালোবেসেছিল, ততটা উলটো দিকে ফিরে যায়। এটা আমাদের এক দুর্বলতা। চরম দুর্বলতা।

অথচ এই সামান্য কারণে সে কখনো বাবা, মা, ভাই, বোন, দল, নেতা—কাউকে ছাড়ে না। কিন্তু যাদের মাধ্যমে সে জান্নাতে যাবে, যাদের সাথে সে জান্নাতে যাওয়ার স্বপ্ন দেখে, তাঁদের ব্যাপারে কিছু শোনার পরপরই তাঁদেরকে ছেড়ে দেয়। উলটো পথে যাওয়া শুরু করে।

বুখারি ﵀ আমাদেরকে ঘটনাটা শোনাচ্ছেন, আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে।

وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي جَعْفَرٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ، قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم " نَادَتِ امْرَأَةٌ ابْنَهَا، وَهْوَ فِي صَوْمَعَةٍ قَالَتْ يَا جُرَيْجُ. قَالَ اللَّهُمَّ أُمِّي وَصَلاَتِي. قَالَتْ يَا جُرَيْجُ. قَالَ اللَّهُمَّ أُمِّي وَصَلاَتِي. قَالَتْ يَا جُرَيْجُ. قَالَ اللَّهُمَّ أُمِّي وَصَلاَتِي. قَالَتِ اللَّهُمَّ

لاَ يَمُوتُ جُرَيْجٌ حَتَّى يَنْظُرَ فِي وَجْهِ الْمَيَامِيسِ. وَكَانَتْ تَأْوِي إِلَى صَوْمَعَتِهِ رَاعِيَةٌ تَرْعَى الْغَنَمَ فَوَلَدَتْ فَقِيلَ لَهَا مِمَّنْ هَذَا الْوَلَدُ قَالَتْ مِنْ جُرَيْجٍ نَزَلَ مِنْ صَوْمَعَتِهِ. قَالَ جُرَيْجٌ أَيْنَ هَذِهِ الَّتِي تَزْعُمُ أَنَّ وَلَدَهَا لِي قَالَ يَا بَابُوسُ مَنْ أَبُوكَ قَالَ رَاعِي الْغَنَمِ ".

'আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "এক মহিলা তার ছেলেকে ডাকল। তখন তার ছেলে গির্জায় ছিল। বলল, 'হে জুরাইজ!' ছেলে মনে মনে বলল, 'হে আল্লাহ! (একদিকে) আমার মা (এর ডাক), আর (অন্যদিকে) আমার নামাজ!' মা আবার ডাকলেন, 'হে জুরাইজ!' ছেলে বলল, 'হে আল্লাহ! আমার মা, আর আমার নামাজ!' মা আবার ডাকলেন, 'হে জুরাইজ!' ছেলে বলল, 'হে আল্লাহ! আমার মা ও আমার নামাজ।' মা বললেন, 'হে আল্লাহ! পতিতাদের সামনে দেখা না যাওয়া পর্যন্ত যেন জুরাইজের মৃত্যু না হয়।' এক রাখালনী—যে বকরি চরাত, সে জুরাইজের গির্জায় আসা-যাওয়া করত। সে একটি সন্তান প্রসব করল। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, 'এ সন্তান কার ঔরসজাত?' সে জবাব দিলো, 'জুরাইজের ঔরসের।' জুরাইজ তার গির্জা হতে নেমে এসে জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় সে মেয়েটি, যে বলে যে, তার সন্তানটি আমার?' (সন্তান-সহ মেয়েটিকে উপস্থিত করা হলে) জুরাইজ বলেন, 'হে বাবূস! তোমার পিতা কে?' সে বলল, 'বকরির অমুক রাখাল।'"'[১৫]

ওপরে হাদীসটি কিতাব থেকে সরাসরি তুলে দিলাম। এখন হাদীসটি নিজের ভাষায় সহজ করে বিস্তারিত বলব।

কুরআন-হাদীস আমাদেরকে বিভিন্ন গল্প-কাহিনি শোনায়। উদ্দেশ্য হলো, গল্পে গল্পে যাতে আমরা আমাদের জীবন গড়ি। এই গল্পগুলো ভালো লাগার জন্য বা চিত্তবিনোদনের জন্য না।

ওই যুগে একটা নিয়ম ছিল। কেউ যদি একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করতে চাইত, তাহলে ঘরবাড়ি সব ছেড়ে একটা নির্দিষ্ট ঘরে আল্লাহর ইবাদতে মশগুল হতো। এই বিখ্যাত বুজুর্গ জুরাইজও আল্লাহকে পাওয়ার জন্য ঘরবাড়ি সব ছেড়ে আলাদা এক ঘরে আল্লাহর ইবাদত করতেন। জুরাইজ তাঁর প্রয়োজন ব্যতীত বাকি সময় অর্থাৎ খাওয়া-দাওয়া, ইসতিনজা ব্যতীত বাকি সময় নামাজে কাটাতেন। একদিন জুরাইজের মা খোঁজখবর নেওয়ার জন্য তাঁর কাছে আসল। জুরাইজ তখন নামাজে। তিনি মায়ের ডাক শুনে নামাজে মনে মনে বলছিলেন,

[১৫] সহিহ বুখারি, হাদীস নং : ১২০৬।

'হে আল্লাহ! মা নাকি নামাজ? মা নাকি নামাজ?'

অর্থাৎ মনে মনে আল্লাহকে একথা বলছিলেন—হে আল্লাহ! আমার মা আমাকে ডাকছে। আমি কি নামাজ চালিয়ে যাব, নাকি মায়ের ডাকে সাড়া দেবো? এভাবে চিন্তা করতে করতে তিনি নামাজ চালিয়ে গেলেন। মা তখন জুরাইজের কাছ থেকে কোনো সাড়া না পেয়ে চলে গেল।

পরের দিন আবার মা জুরাইজের কাছে আসল। তিনি প্রয়োজন ব্যতীত বাকি সময় যেহেতু নামাজে কাটাতেন, তাই তখনো তিনি নামাজ পড়ছিলেন। মা জুরাইজকে ডাকতে লাগল, 'ইয়া জুরাইজ! ইয়া জুরাইজ!'

তখন তিনি মনে মনে আল্লাহকে একথা বলছিলেন—হে আল্লাহ! আমার মা আমাকে ডাকছে। এখন আমি কী করব? নামাজ চালিয়ে যাব, নাকি মায়ের ডাকে সাড়া দেবো? এভাবে চিন্তা করতে করতে তিনি নামাজ চালিয়ে গেলেন। তারপর মা কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে সেই দিনও ফিরে গেলেন।

তৃতীয় দিন মা আবার আসলেন। এসে জুরাইজকে ডাকতে লাগলেন, 'ইয়া জুরাইজ! ইয়া জুরাইজ!'

তখনো তিনি আগের মতো মনে মনে আল্লাহকে একথা বলতে লাগলেন—হে আল্লাহ! আমার মা আমাকে ডাকছে। এখন আমি কী করব? নামাজ চালিয়ে যাব, নাকি মায়ের ডাকে সাড়া দেবো?

তিনি নামাজ চালিয়ে গেলেন।

মায়েরা যদিও ছেলে-মেয়ের সবচেয়ে কাছের মানুষ, কিন্তু বদদুআর ক্ষেত্রে মায়েরা খুব বেশি তাড়াহুড়ো করে। যে ছেলের জন্য মা তার জীবন-যৌবন উৎসর্গ করে দেয়, সারাজীবন অনেক কষ্ট করে, সেই ছেলে যদি বিয়ের পর একটু এদিক-সেদিক করে, তাহলে আর রক্ষা নেই! অন্য কিছু না হোক, মায়ের জবান তো আছে! যা-ই হোক, এভাবে জুরাইজের মা যখন তৃতীয় দিন এসেও ছেলের কাছ থেকে কোনো সাড়াশব্দ পেল না, তখন মা জুরাইজকে বদদুআ দিতে লাগল: 'হে আল্লাহ! জুরাইজ যেন কোনো পতিতার চেহারা না দেখে কখনো না মরে!'

পতিতার চেহারা সাধারণত খারাপ মানুষেরাই দেখে। যে জুরাইজ বাড়ি-ঘর সবকিছু ছেড়ে আল্লাহকে পাওয়ার জন্য বের হয়ে গিয়েছে, তাঁর জন্য এটা কত মারাত্মক বদদুআ! এজন্য শরীয়ত মায়ের ব্যাপারে খুব সিরিয়াস। শরীয়ত নির্দেশ দিয়েছে, মায়ের সাথে ব্যবহার যাতে সবচেয়ে বেশি কোমল হয়। কেননা মায়েরা সাধারণত একটু কষ্ট পেলেই রাগের মাথায় এমন কিছু বলে ফেলে—যা

সন্তানের জন্য ক্ষতির কারণ হয়। আবু হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত,

وَعَنهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي ؟ قَالَ أُمُّكَ قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَأُمُّكَ قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ أُمُّكَ قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَأَبُوكَ متفقٌ عليه وَفِيْ رِوَايَةٍ : يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ الصُّحْبَةِ ؟ قَالَأُمُّكَ ثُمَّ أُمُّكَ ثُمَّ أُمُّكَ ثُمَّ أَبَاكَ ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ

একটি লোক রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করল, "হে আল্লাহর রাসূল! আমার কাছ থেকে সদ্ব্যবহার পাওয়ার বেশি হকদার কে?" তিনি বললেন, "তোমার মা।" সে বলল, "তারপর কে?" তিনি বললেন, "তোমার মা।" সে বলল, "তারপর কে?" তিনি বললেন, "তোমার মা।" সে বলল, "তারপর কে?" তিনি বললেন, "তোমার বাবা।"[১৬]

অন্য এক বর্ণনায় আছে, 'হে আল্লাহর রাসূল! সদ্ব্যবহার পাওয়ার বেশি হকদার কে?' তিনি বললেন, 'তোমার মা, তারপর তোমার মা, তারপর তোমার মা, তারপর তোমার বাবা, তারপর যে তোমার সবচেয়ে নিকটবর্তী।'[১৭]

যা-ই হোক, বাকি ঘটনা বলি। বনী ইসরাঈলের কাছে জুরাইজ অনেক প্রিয় ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর কথা সবার মুখে মুখে ছিল। সবাই তাঁর ইবাদতের খুব প্রশংসা করত।

এখন ওই যুগের এক খারাপ মহিলা সবার কাছে বলল—তোমরা যাকে এত ভালো বলছো, দেখো আমি তাকে কিভাবে কাবু করি!

তারপর সে জুরাইজের কাছে গেল। কিন্তু জুরাইজ তো নামাজে! তাঁর তো কারও দিকে তাকানোর সময়ই নেই। পরে ওই নারী যখন দেখল জুরাইজ তাকে পাত্তা দিচ্ছে না, তার দিকে তাকাচ্ছেই না, তখন জুরাইজের সাথে এক রাখাল ছিল, সে ওই রাখালের সাথে অপকর্মে লিপ্ত হলো।

পরবর্তীকালে আস্তে আস্তে ওই নারীর পেটে বাচ্চা আসল। ওই নারীর ইচ্ছা ছিল যেভাবেই হোক জুরাইজের নামে অপবাদ দেবে।

যেহেতু ওই নারী অবিবাহিতা ছিল, তাই বাচ্চা হওয়ার পর মানুষেরা জিজ্ঞাসা করতে লাগল যে, সে বাচ্চা কোথায় পেল? তখন ওই মহিলা বলল—এই বাচ্চা

[১৬] বুখারি, ৫৯৭১; মুসলিম, ৬৬৬৪।
[১৭] মুসলিম, ৬৬৬৫।

জুরাইজের। আমি বলছিলাম যে, আমি জুরাইজকে ফিতনায় ফেলব। আর এই ফিতনার ফল এই বাচ্চা। এই বাচ্চা জুরাইজ থেকে হয়েছে।

ঠিক তখনই—যারা আগে জুরাইজকে খুব পছন্দ করত, তাঁকে দেখার জন্য সব সময় উদগ্রীব থাকত, তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিল—তারাই জুরাইজের বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লেগে গেল। যাচাই-বাছাই করার কোনো গরজ করল না। জুরাইজের ওপর প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়ে গেল। কোনো কিছু চিন্তা না করেই, বিচার-বিশ্লেষণ না করেই সবাই একমত হয়ে গেল যে, 'জুরাইজের বিচার করতে হবে। তাকে এভাবে ছেড়ে দেওয়া যায় না। আমরা তো তাকে অনেক বড় বুজুর্গ মনে করতাম, অথচ সে এত বড় অকাজ করে বসল।' তারা একবারও চিন্তা করল না যে, জুরাইজ কি ঘটনা সত্যিই ঘটিয়েছে, না এর পেছনে কোনো ষড়যন্ত্র আছে?

শয়তান সব সময় এই সুযোগই নেয়। দ্বীনি ক্ষেত্রে যাকে আমরা আদর্শ বা নেতা মনে করি, যাদেরকে দ্বীনের কারণে ভালোবাসি, তাদের ব্যাপারে কিছু শোনামাত্রই একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে নিই। ঘটনার আগপিছ খেয়াল করি না। অথচ আমরা নিজেরাই কত হাজার গুনাহে জর্জরিত! আমাদের ছেলে-মেয়ে, স্বামী-স্ত্রী, বাবা-মা কত অপরাধ করে! কিন্তু তাদের বেলায় সাথে সাথে কোনো সিদ্ধান্ত নিই না। সাথে সাথে তাদেরকে ছুড়ে ফেলি না। সম্পর্ক ছিন্ন করি না।

কিন্তু দ্বীনের জন্য যাদের সাথে সম্পর্ক, তাঁদের ব্যাপারে কিছু শোনামাত্রই আমরা কোনো রকম বিচার বিশ্লেষণ না করেই অযাচিত মন্তব্য করে বসি। তাঁদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলি।

যদি মেনে নিই, তাঁরা সত্যিই সেই অপরাধ করেছে, তারপরও কি তাঁদের সঙ্গ ত্যাগ করার অনুমতি আছে? তাঁরা শুধু গুনাহই করে? তাঁরা তো তাওবাও করে। আচ্ছা, আলিমদের ছাড়া আমার অন্যান্য আত্মীয়দের সাথে কি আমি এ আচরণ করি? আলিমদের মতো তাদেরকেও ছেড়ে দিই? অপরাধের কারণে আত্মীয়-স্বজনদের সাথে যে আচরণ করি, তাঁদের সাথেও তো সেরকম আচরণই করার কথা ছিল। নিজেদের ব্যাপারে, নিজেদের অন্যান্য আত্মীয়দের ব্যাপারে যে ছাড় আমি দিই, তাঁদের ব্যাপারেও কি সেরকম ছাড় দেওয়া উচিত ছিল না?

যা-ই হোক, পরবর্তীকালে জুরাইজের ইবাদতগাহে সবাই লাঠিসোঁটা নিয়ে গেল। বেচারা তখন নামাজ পড়ছিল। তাঁকে টেনেহিঁচড়ে তাঁর ঘর থেকে বের করল। ঘর আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিলো। নষ্ট করে দিলো।

জুরাইজ তো অবাক। সে কিছুই বুঝতে পারছে না। তারপর তাঁর সাথে কোনো কথা না বলেই, কোনো কথা না শুনেই সবাই ইচ্ছামতো তাঁকে মেরে অজ্ঞান